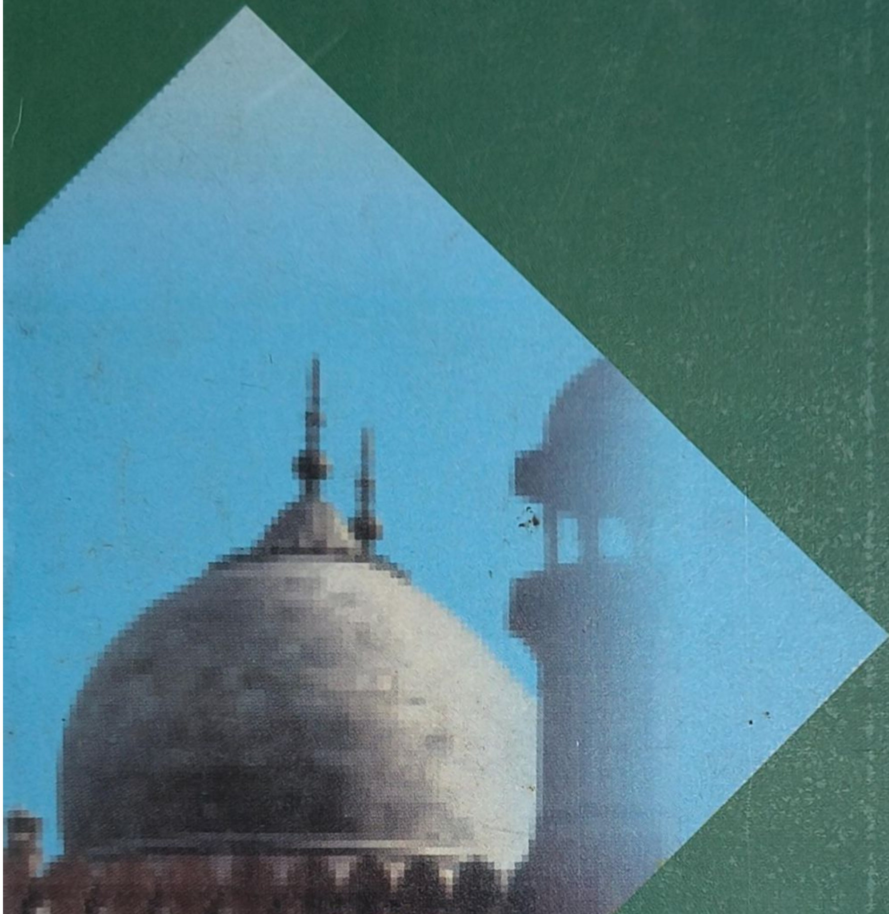
ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র



আবুল হাসানাত নদভী

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র

মূল

আবুল হাসানাত নদভী

অনুবাদ

গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র
মূল ঃ আবুল হাসানাত নদভী
অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৪৭
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১৯৪
ইফাবা গ্রন্থাকার ঃ ৩৭৭.০৯৫৪
ISBN : 984—06—0846—X

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৪
আষাঢ় ১৪১১
জুমাদাল উলা ১৪২৫

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ অংকনে
জসিম উদ্দিন

মূল্য : ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা।

Bharotio upomohadesher prachin Islami Shikka kandro (The Ancient Islamic Education centers of Indian) written by Abul Hasanat Nadvi Director Translated by Golam Subhan siddiqi in Bangla and Published by Translation and Compaisation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla nagar. Dhaka-1207. June-2004

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org
Price : TK 30.00. U.S. Dollar : 1.00

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৯
সূচনা	১২
সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত	১৮
ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন	২০
আজমীরের মাদ্‌রাসাসমূহ	২৩
দিল্লীর মাদ্‌রাসাসমূহ	২৩
আলাউদ্দীন খিলজীর মাকবারার মাদ্‌রাসা	২৪
ফীরুজ শাহী মাদ্‌রাসা	২৬
বালাবন্দ আবসিরী মাদ্‌রাসা	২৬
পানজাবের মাদ্‌রাসাসমূহ	৩১
লাহুর	৩১
শেখ চিল্লির মাদ্‌রাসা, আনেশ্বর	৩৩
শের শাহের মাদ্‌রাসা, নারনোল	৩৩
আগরার মাদ্‌রাসাসমূহ	৩৩
ফহেতপুর সিক্রির মাদ্‌রাসাসমূহ	৩৫
মথুরা ও নরওয়ার মাদ্‌রাসাসমূহ	৩৬
বাদায়ূলের মাদ্‌রাসাসমূহ	৩৭
মাদ্‌রাসা দারা নগর	৩৮
রামপুরা মাদ্‌রাসা	৩৮
শাহ্‌জাহানপুর ও বেরেলীর মাদ্‌রাসা	৩৮
পেলিতে মাদ্‌রাসা	৪০
অযোধ্যার মাদ্‌রাসাসমূহ	৪০
শেখ নিযামুদ্দীন আনসারী সুহালীর মাদ্‌রাসা	৪১
শাহ পীর মুহাম্মদের মাদ্‌রাসা, লক্ষ্ণৌ	৪১

ফররুখাবাদের মাদ্‌রাসাসমূহ ৪৩
জৌনপুরের মাদ্‌রাসাসমূহ ৪৪
ইটালার মসজিদ ৪৬
বেনারস ৪৬
আযমগড় ৪৬
ওলীদপুর ৪৬
গাজীপুর ৪৬

বিহারের মাদ্‌রাসাসমূহ ৪৬
বিহারের মশহুর ইলমী কসবা ও গ্রাম ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, বিহার ৪৮
মালের ৪৮
সাহ্‌সাবাস ৪৯
রূহাই ৪৯
ডি আনওয়া ৪৯
মহিউদ্দীনপুর ৪৯
নগর নহ্‌শা ৪৯
বিসি ৫০
কাহাট্টা ৫১
গীন্দানী ৫১
আস্থানাওয়া ৫১
রহীমাবাদ ৫১
সাহ্‌সারাম ৫১
পুলওয়াবী বানকার মাদ্‌রাসা ৫২
পাটনা মাদ্‌রাসা ৫২

বাংলার মাদ্‌রাসাসমূহ ৫৩
ঢাকা ৫৪
মুর্শিদাবাদ ৫৭
বোহার ৫৮
দাক্ষিণাত্যের মাদ্‌রাসা ৫৯
বেদর মাদ্‌রাসা ৫৯
গুলবার্গা ৬০
গুল কুন্ডা ৬০
চাহার মিনার ৬০
ইয়াতীমের জন্য মাদ্‌রাসা ৬১

বিজাপুর	৬১
আহ্সাননগর	৬২
বুরহানপুর	৬২
দৌলতাবাদ	৬২
মাদ্রাজের মাদ্রাসা	৬২
সালওয়ারা মাদ্রাসা	৬৩
সারেরপুর	৬৫
জাফরাবাদ	৬৮
মুলতান ও উচ-এর মাদ্রাসাসমূহ	৬৮
কাশ্মীরের মাদ্রাসাসমূহ	৭১
গুজরাটের মাদ্রাসাসমূহ	৭৩
মাদ্রাসাই সাইফলান	৭৩
মাদ্রাসাই শায়খুল ইসলাম	৭৩
মাদ্রাসা সরলিম	৭৩
মাদ্রাসা মজিউদ্দীন	৭৪
মাদ্রাসাই নহ্র ওয়ালা	৭৪
মাদ্রাসাই তালাব	৭৪
মাদ্রাসাই উসমানপুর	৭৪
সুরাটের মাদ্রাসাসমূহ	৭৪
শিক্ষাবিস্তারের অন্যান্য মাধ্যম	৭৫
ব্যক্তি কেন্দ্রীক শিক্ষা	৭৭
দেশ দেশান্তর থেকে ভারতবর্ষে উলামার আগমন ও শিক্ষা বিস্তার	৮২
হিন্দুস্তানের মশহুর আলিম	৮৩
প্রাচীন আরবী পাঠ্যসূচী	৮৫
প্রথম পর্যায়	৮৫
দ্বিতীয় পর্যায়	৮৭
তৃতীয় পর্যায়	৮৮
চতুর্থ পর্যায়	৯০
ইলমুল হাদীস	৯১
পঞ্চম পর্যায়	৯১
ইলমুস সরফ	৯১
ইলমুল আদব	৯১
ইলমুল ফিকাহ্	৯১

ইলমুল কালাম	৯২
ইসলমুল হাদীস	৯২
শেষ পর্যায়ের এ পাঠ্যসূচীর ত্রুটি-বিচ্যুতি	৯২
পুস্তক বিন্যাস ও শিক্ষার পদ্ধতি	৯৩
শ্রেণী বিন্যাস	৯৪
ছাত্রদের জন্য উপাধী	৯৪
জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র	৯৫
ফারসী ভাষা	৯৫
শিক্ষা পদ্ধতি	১০৫
ফারসী পাঠ্যসূচী	১০৬
শেষকথা	১১০

মহাপিরিচালকের কথা

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন হয়েছে সাহাবীদের যুগে। দীর্ঘ যুগ থেকে সামাজিক জীবনে ইসলামের চর্চা ও অনুশীলন উপমহাদেশে পূর্ণতা ও সফলতার সাথে চলেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখানে মুসলমানগণ অগ্রসরমান ছিলেন। বিশেষ করে হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ পতনের পর ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র বাগদাদ থেকে দিল্লী ও ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত হয়।

১২০০ খৃস্টান্দ থেকে ১৬০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত (চারশত বছর) মুসলিম উম্মাহর উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল উপমহাদেশে। এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশ থেকেই শিক্ষার্থীগণ এ সর্ব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। বৃটিশ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকে ছিল।

উপমহাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি চর্চার সাথে এ সব প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিখ্যাত আলিম চিন্তাবিদ আবুল হাসানাত নদভী (র) এ সব প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও পরিচিতি তুলে ধরেছেন তাঁর "হিন্দুস্থান কি কাদীম দরসগাহে" গ্রন্থে। তৎকালীন পদ্ধতি ও শিক্ষার স্তর এবং বিখ্যাত পণ্ডিতদের পরিচিতিসহ বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক দীর্ঘ পাঁচশত বছরের ক্রমবিকাশের ইতিহাস তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস গ্রন্থ।

আমাদের ইতিহাস জানার প্রয়োজনে "ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র" এই মূল্যবান গ্রন্থটি অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। দক্ষ অনুবাদক মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকীর হাতে বইটি অনূদিত হয়েছে এবং সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী।

আমরা মরহুম লেখকের জন্য দু'আ করি। আমরা অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকেই আমাদের ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্ তা'আলা এদেশে আমাদের ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরার তাওফীক দিন। আমীন !

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ ও মানব সত্তার উজ্জীবনে যুগ-যুগান্তরের ক্রমবিকাশের ধারায় ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী চেতনার উন্মেষ বিনির্মাণে প্রধান ও মুখ্য ভূমিকা পালনে অব্যাহত প্রচেষ্টার সার্থক স্ফুরণ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল সম-সাময়িককালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও এর ব্যাপ্তি এ ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামী আচার-আচরণ, রীতি-নীতি বিশেষ করে ধর্মীয় অনুশাসনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের নিরিখে পরিচালিত কর্মসূচির মাধ্যমে দুঃশাসন ও অপসংস্কৃতির বেড়াজাল ছিন্ন করে মুসলিম উম্মাহর জন্য যে আদর্শের অনুরণন ও প্রতিফলন ঘটেছিল ইতিহাসে তা আজও অম্লান হয়ে আছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র বইটিতে দীর্ঘ কয়েকশত বছরের প্রাচীন মাদ্রাসার পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূত্র ধরেই বর্তমানের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্য জড়িত।

মূল বইটি উর্দূতে রচনা করেছেন আবুল হাসানাত নদভী, অনুবাদ করেছেন মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী এবং সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রুফ রিডিং করেছেন মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই। আমরা লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রুফ রিডারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আমরা আশা করি বাংলাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস কেউ রচনা করলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সমস্ত বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক এ দেশের ইসলামী জ্ঞান পিপাসু জনগণের খেদমতে তা প্রকাশ করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাব। আমরা এ গ্রন্থটি সুন্দরভাবে প্রকাশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আশাকরি বইটি পাঠকদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের সার্বিক প্রচেষ্টায় আমরা কোন ত্রুটি করিনি.। তারপরেও সুধীজনের নজরে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব ইন্‌শা আল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এদেশে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার তাওফীক দিন। আমীন !

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

বক্ষমান পুস্তকটি ১৯১৯ সালে 'মাআরিফ'-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত নিবন্ধের সংকলন। উক্ত মাসিক পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। যা পাঠক মহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। তাঁদের অনেকেই তা পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। লেখকের দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে এ প্রস্তাব তখন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাবের জনৈক প্রকাশক তা প্রকাশ করলেও সেটা ছিল পুস্তকটির বিকৃতরূপ। জ্ঞানীগুণীদের কাছে তা পৌঁছতেই পারেনি। স্বয়ং লেখক নিজেও দীর্ঘ অসুস্থতার হাত থেকে নিরাময় হয়ে উঠতে পারেননি; যুবা বয়সেই অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক আকাংখা বুকে নিয়ে তিনি এ পৃথিবীকে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

লেখক

এ পুস্তকের রচয়িতা মরহুম মওলবী আবুল হাসানাত আবদুশ শাকুর নদভী মরহুম বিহার প্রদেশের পাটনা জেলাধীন আশরাফপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এ গ্রামটি বিহার প্রদেশের অনেক কৃতীসন্তানের জন্মদাত্রী, প্রসিদ্ধ জনবহুল অঞ্চল ডয়াওয়ান ও নগর নাহসার আশপাশেই অবস্থিত। ১৯১৩ সালে কোলকাতায় (মরহুম মাওলানা আযাদ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সাড়া জাগানো সাপ্তাহিক পত্রিকা) আল-হেলাল পত্রিকার অফিসে মরহুমের সাথে ঘটনাক্রমে আমার সাক্ষাত হয়। তখন তিনি তরুণ। কিন্তু তাঁর চেহারায় প্রতিভার ও বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট ছায়া ছিল। তখন তিনি কেবল কুতবী মুখতাসারুল মাআনী পর্যায়ের ছাত্র। কিন্তু ইসলামী রাজনীতির জোশ তাঁকে কোলকাতায় আল হিলালের দফতর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

এরপর তিনি আমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেন। আমি তাঁর সুপ্ত প্রতিভা লক্ষ্য করে সাময়িক রাজনৈতিক ডামাডোলের পরিবর্তে শিক্ষা সমাপনের জন্য উৎসাহিত করি। যতদিন তিনি কোলকাতায় ছিলেন, আমি নিজেই তাঁকে পড়িয়েছি। এরপর কয়েকমাস পরে আমাকে দাক্ষিণাত্য কলেজের অধ্যাপনার জন্যে পুনা যেতে হলে তাঁকে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌয়ে প্রেরণ করি। সেখানে তিনি ১৯১৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন।

ফার্সী কাব্য চর্চার প্রতি তাঁর স্বভাবজাত ঝোঁক ছিল। কোন ওস্তাদ ছাড়াই তিনি ফার্সীতে গযল ও কসীদা রচনা করতেন। ১৯১৪ সালে মওলানা শিবলী মরহুমের শেষ জীবনে তিনি মওলানা মরহুমের খিদমতে তাঁর রচিত একটা ফার্সী কসীদা প্রেরণ করেন। কসিদাটি দেখে মওলানা মরহুম তাঁর সম্পর্কে লিখেন ঃ

'আব্দুশ শাকূরের একটা কাসীদা পেলাম। .... কাসীদায় কিছু ভুল-ত্রুটি এবং দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু তার যোগ্যতা আছে, তাই এমন অপরিপক্কতা কাটিয়ে উঠতে তেমন সময় লাগবে না। (মওলবী মাসউদ আলী সাহেব নদভীর নামে লিখিত পত্রাবলী-২৫)।

মওলানা মরহুম তাঁর প্রস্তাবিত দারুল মুসান্নিফীন-এ যাদেরকে গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এটি মাওলানা মরহুমের ওফাতের পর দারুল মুসান্নিফীন প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকেও সেখানে আহবান করা হয়। প্রায় ৬ বছর (১৯১৮-১৯২৪) ইনি দারুল মুসান্নিফীন এর প্রশিক্ষণাধীন ছিলেন। এ সময় তাঁর লিখনী থেকে অনেক চিন্তাকর্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ মা'আরিফ ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হলে তুর্কীদের পক্ষে হিন্দুস্তানী ভাষায় সর্বপ্রথম তাঁরই নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, যা পাঠক মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং অনেকে তা স্বতন্ত্রভাবে ছেপেও প্রকাশ করেন।

তাঁর কাছে আমাদের এবং মুসলমানদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা সকল ইচ্ছার উপর বিজয়ী। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১২ রবিউস সানী ১৩৪৩ হিজরী মোতাবেক নভেম্বর ১৯২৪ সালে বিহারের রাজগীর-এ তিনি মৃত্যু পরওয়ানাকে স্বাগত জানান। সেখানে তিনি হাওয়া বদলের জন্য গিয়েছিলেন।

পুস্তক

হিন্দুস্তানে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসতো ঢের লেখা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস লেখা হয়নি বললেই চলে। এ কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুস্তানে মুসলমানদের কীর্তি নিতান্তই ক্ষীণ বলে প্রতীয়মান হয়। অথচ বাস্তব চিত্র কিন্তু তা নয়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, হিন্দুস্তানে মুসলমানদের মাদ্রাসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কোন গ্রন্থে স্বতন্ত্র শিরোনামে দেখাই যাবে না। এ কারণে আমাদের একজন নামকরা লেখক পর্যন্ত এ ভ্রম প্রমাদের শিকার হয়ে পড়ে যে, হিন্দুস্তানে মুসলমানরা মাদ্রাসা নামে কোন ইমারত আদৌ নির্মাণই করেনি।

এ কারণে ইচ্ছা ছিল হিন্দুস্তানে মাদ্রাসার অবস্থা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে স্বতন্ত্রভাবে লেখার। এ গ্রন্থের মরহুম রচয়িতা আমার সে সাধটি পূরণ করেছেন। তিনি যেখানে সামান্য তথ্য পেয়েছেন তা সংগ্রহ করে বিপুল তথ্য সম্ভার আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় প্রাচীন ঐতিহাসিকরা রাজা-বাদশাহদের যুদ্ধ-বিগ্রহ আর দরবারীদের রঙ্গ কৌতুকের বর্ণনা ছাড়া জাতির শিক্ষা ও তমদ্দুনের চিত্র অংকনে খুব কমই আনন্দ পেতেন। এ কারণে তাঁদের গ্রন্থে এ ধরনের তথ্য যৎ সামান্যই পাওয়া যায়। এ কীর্তি মোটেও কম উজ্জ্বল মনে হতো না।

মুহাম্মদ তুগলকের শাসনামলে মিসর এবং হিন্দুস্তানের মধ্যে যোগাযোগ অনেক বৃদ্ধিপায়। সে সময়ের একটি মিসরীয় লেখায় হিন্দুস্তানের পর্যটকদের মৌখিক উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, কেবল হিন্দুস্তানের রাজধানী দিল্লীতেই তখন এক হাজার মাদ্‌রাসা ছিল। এগুলোর মধ্যে একটা ছিল শাফেয়ীদের, বাকী সবগুলো ছিল হানাফীদের (কালকাশান্দী রচিত সুবহুল আশা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯, মিসর)।

এতো ছিল সূচনা পর্ব। এবার সমাপ্তি পর্ব শুনুন। আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনামলের জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক কাপ্তান আলেকজান্ডার হ্যামিলটন সিন্ধুর শহর থাট্টা সম্পর্কে লিখেন ঃ

থাট্টা শহরে বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৪শ মাদ্‌রাসা রয়েছে মির্জা সামীউল্লাহ বেগ রচিত হিন্দুস্তান আহদে আলমগীর মেঁ (আলমগীরের শাসনামলের হিন্দুস্তান গ্রন্থ) দ্রষ্টব্য।

قیاس کن ز گلستان سن بہار مرا

— আমার ফুল বাগান থেকেই ধারণা করুন কেমন ছিল আমাদের গোটা বসন্ত কালটা।

দিল্লীর সেই এক হাজার আর থাট্টার সেই চারশ মাদ্‌রাসার অবস্থা এখন কে বলতে পারবে। যাই হোক, একজন শিক্ষার্থীর চেষ্টায় হিন্দুস্তানে ইসলামী মাদ্‌রাসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যতটুকু জানা গেছে তা আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে আপনাদের সম্মুখে রয়েছে।

সাইয়িদ সুলায়মান নদভী
১২ মার্চ ১৯৬৬।

সূচনা

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাস যে বিপুল এবং রকমারি উপাদানরাশির সমাহার, সেগুলোর মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত উপাদান বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বের অধিকারী। হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ তমদ্দুনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দিক থেকে যেমনি পঞ্চম শতাব্দীর হিন্দুস্তান থেকে ভিন্ন, অবিকল তদ্রূপই ভিন্ন মন-মানস আর শিক্ষাগত দিক থেকেও। এই ভিন্নতা, এই পরিবর্তন কি করে এবং কিভাবে সৃষ্টি হলো ? তার পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন এবং ক্রমোন্নতির গতি কি ছিল ? —এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়, এ পুস্তকেও সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। অবশ্য এর নানাবিধ কারণের অন্যতম কারণ শিক্ষা এবং তার প্রচার-প্রসারের সাথে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের এক ভাসাভাসা কাঠামো চিত্র এতে অংকিত হয়েছে এবং এ আলোচনার বিভিন্ন দিক এতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

একটি তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষণ আকারে নাদওয়াতুল উলামার অধিবেশনে পেশ করার উদ্দেশ্যে এটাকে আমি বিষয়বস্তু রূপে বেছে নিয়েছিলাম। এ ছিল এক সীমিত এবং তার ক্ষণিক প্রয়োজন। কোন গণসমাবেশে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করার জন্য সে বিষয়ে বিস্তারিত এবং খুঁটিনাটি আলোচনা করতেই হবে, তা জরুরী নয়। এ কারণে তার বয়ানের সকল অংশেই মোটামুটি আলোচনা দ্বারা কাজ চালানো হয়। কিন্তু যেহেতু এ ছিল ঐতিহাসিক শিরোনাম, এ কারণে বক্তব্যের সকল অংশ ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি এবং বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তা সত্ত্বেও আরো চেষ্টা সাধনার পর যে ধরনের অনুসন্ধিৎসা আর পুঙ্খানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা এ বিষয়ে লিখনী ধারণ করা যেতে পারতো, আমি খোলাখুলি স্বীকার করছি যে, এ পুস্তকে তা অনুপস্থিত। এটা নিশ্চিত যে, এ শিরোনামের সাথে সংশ্লিষ্ট বক্ষমান এ ঐতিহাসিক উপকরণের চেয়ে বেশি তথ্য এখনো সংগ্রহ করা যায়। এ ধারণা নিশ্চিত হয়েছে এভাবে যে, ঐতিহাসিক প্রাচীন গ্রন্থ রচনার যে ধরন, এবং তাতে ঘটনা পরম্পরার যে বিপুল সমাহার থাকে, তা দেখে প্রথম প্রথম এ শিরোনামে হাত দিতে মন ইতস্ততঃ করে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় মওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভীর পীড়াপীড়ি মিশ্রিত নির্দেশ আমাকে বাধ্য করেছে। অবশেষে আমি যখন এ উদ্দেশ্যে ইতিহাসের পাতা অধ্যয়ন শুরু করি, তখন আল্লাহ্র ফযলে আমার প্রাণান্তকর পরিশ্রম বৃথা যায়নি। অনুসন্ধান আর তত্ত্ব-তথ্য সংগ্রহের কদম যতই সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে, ততই আশাতীত প্রশস্ততার ময়দান দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

তখন যেহেতু তথ্য সংগ্রহের খুবই সীমিত উপকরণ সম্মুখে ছিল এ কারণে সে তত্ত্ব-তালাশের যে অসম্পূরক এলবাম তৈরি হয়েছে, তা আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে দেখতে পাবেন। এ গ্রন্থ রচনায় যেসব কিতাবের সাহায্য গৃহীত হয়েছে, তার বরাত মূল পুস্তকে বর্তমান রয়েছে। এবং যেহেতু এগুলো সহজপ্রাপ্য ও বহুল প্রচলিত কিতাব, তাই এখানে সেগুলো সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। এমন কোন দুর্লভ ও বিরল গ্রন্থ সামনে ছিল না, যার উল্লেখ বিশেষকরে করতে হবে। অবশ্য খুলাছাতুৎ তাওয়ারীখ (خلاصة التواريخ) -এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এবং একটি ইংরেজী গ্রন্থ PROMOTION OF LEARNING IN INDIA DURING MOHAMMADAN RULE সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরী। এ দু'টি পুস্তকের রচয়িতাই হিন্দু। প্রথমোক্ত পুস্তকটি সম্রাট আলমগীরের শাসনামলের রচনা, এর হাতের লেখা কপি পেয়েছি আমি (বিহার প্রদেশের) দিসনার আল-ইসলাহ্ লাইব্রেরী থেকে আর শেষোক্ত পুস্তক হচ্ছে বর্তমান কালের একজন বাংগালী হিন্দু লেখকের লিখনী নিঃসৃত। এতে মুসলিম শাসকদের জ্ঞান চর্চা এবং শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ মক্তব-মাদ্‌রাসা, আলিম-উলামা, গ্রন্থকার সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে, যদিও প্রতীয়মান হয় যে, লেখক মূল ভাষা (ফার্সী) সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং দায়িত্বহীন লেখকদের উদ্ধৃতি আর অনুবাদের উপরই তিনি নির্ভর করেছেন, এ কারণে কোথাও কোথাও দুর্বলতা, ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি এমনকি গুরুতর ভুলও পরিদৃষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও পুস্তকটি সাধারণভাবে সফল হয়েছে তার বিষয়বস্তুতে এবং লেখকের চেষ্টা সবদিক দিয়ে প্রশংসাই পাওয়ার যোগ্য। এ উপলক্ষে আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম শ্রেণীর নিকট এ প্রশ্নটি কম চিত্তাকর্ষক হবে না যে, এ দায়িত্বটি হিন্দু লেখকের ছিল, না কি তা অন্য কারো ছিল ইনসাফকে সামনে রেখে আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁরা এ জিজ্ঞাসার জবাব দিন!

ইতিহাসের প্রচলিত ফার্সী গ্রন্থগুলোই ভারতের ইতিহাসের সবটুকু নয়। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক উপাদেয় এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রয়েছে, এ গ্রন্থ রচনাকালে সেগুলো হাতের কাছে পাইনি। এসব দেখতে হলে দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারগুলো চষে বেড়ানো ছাড়াও ব্যক্তিগত পাঠাগার সমৃদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছাও জরুরী। উপরন্ত মুসলিম শাসনামলে হিন্দুস্তানে জ্ঞান চর্চার অগ্রগতি দেখানোর জন্য বুযুর্গানে দীন, বড় বড় মাশায়েখ এবং অন্যান্য আলিম-ফাযিলদের জীবনেতিহাস, তাঁদের মূল কথা তথা মুখ নিঃসৃত সংকলন এবং পত্রাবলীর পাতা ঘাটাঘাটিও অতীব প্রয়োজনীয়। এগুলো হচ্ছে সেসব ঐতিহাসিক ভাণ্ডার, যার পুংখানুপুংখ অধ্যায়ন হিন্দুস্তানের অতীতের জ্ঞান ও শিক্ষার অগ্রগতির চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবে।

কিন্তু এখানে আরো একটি তথ্য ভাণ্ডারের প্রতি ইঙ্গিত করাও প্রয়োজনীয় মনে হয়, যা বিশুদ্ধতা ও বাস্তবতায় ঐতিহাসিক গ্রন্থের বিবরণ থেকেও অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক উত্তম, তা হচ্ছে মুসলিম শাসকদের ফরমানসমূহ যা হিন্দুস্তানের বহু হিন্দু মুসলিম পরিবারে সংরক্ষিত রয়েছে। এসব ফরমান হিন্দুস্তানের ইতিহাসের অতি মূল্যবান ভাণ্ডার। এসব থেকে হিন্দুস্তানের অতীত ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকসম্পাত হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এগুলোতে যেমন অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে এ দেশের মুসলিম শাসকরা দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে যেসব চেষ্টা-সাধনা করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণও।

এ পুস্তকে শিক্ষা বিস্তারের অন্যান্য মাধ্যম, শিরোনামে যা কিছু লিখা হয়েছে, তাতে সংক্ষেপে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমে ইচ্ছা ছিল, এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত লেখা দরকার। কিন্তু কিছু অপরিহার্য কারণে তা সম্ভব হয় নি। ভারতবর্ষের খুব কম মুসলিম শাসকই এমন ছিলেন, যারা হিন্দুদের পণ্ডিত গুরু গোঁসাই প্রমুখ ধর্মীয় ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের ভাতা বা জায়গীর নির্ধারণ না করেছেন। ইউরোপীয় লেখকরা বাদশাহ আলমগীর আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের কল্প কাহিনী ফলাও করে প্রচার করেছে। তাদের রচিত পুস্তকাদিতে তারা এটাকে অনেক রং চড়িয়ে উপস্থাপন করেছে। ফলশ্রুতিতে গোটা দেশে নিতান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়ে এবং এই পবিত্রাত্মা এবং প্রজাবৎসল বাদশাহকে যালিম, নির্যাতনকারী এবং হিন্দুহন্তা ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়। ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, তাঁর কোন মর্যাদাযোগ্য গুণের আওয়াজ তোলা হলে তা এই প্রচারণার ডামাডোলের নীচে চাপা পরে যায়।

আসল সত্য ও বাস্তব তথ্য এই যে, এসব ছিল নিছক প্রচারণা। এর পেছনে সত্য খুব কমই রয়েছে। বরং সম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বিপরীতে ধর্মীয় উদারতা এবং শান্তি প্রিয়তার সাক্ষ্যপ্রমাণই পাওয়া যায়। ধর্মীয় পণ্ডিত গুরু-গোঁসাইয়ের নামে মুসলিম শাসকদের অনেক ফরমান আমি নিজেও দেখেছি। এসব ফরমান বলে তাঁদেরকে শাহী দান, জায়গীর, নিষ্কর ভূমি দেওয়া হয়েছে। এ সবের মধ্যে সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের ফরমানও রয়েছে। সম্ভবত এ তথ্য খুব কম লোকেরই জানা আছে যে, প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান বুদ্ধ-গয়া, ভারতবর্ষের মহান সংস্কারক মহাত্মা বুদ্ধ যেখানে 'সিদ্ধি' লাভ করেছিলেন, বুদ্ধের এ মহান তীর্থস্থান সম্পর্কিত কয়েক লাখ টাকার ওয়াকফ কৃত সম্পত্তির সবটুকুই মুসলিম রাজা বাদশাহদের উদারতা মহানুভবতারই ফসল। এ বিশাল সম্পত্তির বিরাট অংশ সম্রাট আলমগীরের দান। আলমগীর এবং অন্যান্য বাদশাহদের ফরমান এখনো সেই ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী পরিবারে সংরক্ষিত আছে।

আল্লামা শিবলী নু'মানী নাদওয়াতুল উলামার বেনারস অধিবেশন উপলক্ষে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। এতে এ ধরনের অনেক ফরমান পরিদৃশ্য হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতীব গুরুত্বপূর্ণ রত্ন ভাণ্ডার। এ কারণে এ মূল্যবান রত্ন ভাণ্ডার সামনে না রেখে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করা হলে তা বহুলাংশে অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

পরিশেষে এ কথাও বলে দেওয়া জরুরী যে, এ পুস্তকের এক বিরাট অংশ যদিও বক্তৃতার প্রয়োজনে নোট আকারে সাজানো হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সে কাজে তা লাগানো যায় নি এবং পরে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এই অতীব মূল্যবান নোটগুলো কিছুতেই বিনষ্ট হতে দেওয়া যায় না, বরং এটাকে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে সংকলিত করা উচিত, এ কারণে পুস্তকারে পুনর্বিন্যাস কালে এতে তার অনেকাংশই সংযোজিত করা হয়েছে। উপরন্তু বক্তৃতার রূপ পরিবর্তন করে তাকে পুস্তকের রূপ দেওয়া হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে নাদওয়াতুল উলামার রেক্টর আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা সাইয়্যেদ আবদুল হাই-এর শুকরিয়া আদায় করাও আমার কর্তব্য মনে করি, এ জন্য যে, তাঁর নিবন্ধ "হিন্দুস্তান কা কাদীম নেসাবে দারস" থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। এ পুস্তকের যেখানে প্রাচীন পাঠ্য পুস্তকের ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রায় সবটুকুই তাঁর নিবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে। তাঁর আরো শুকরিয়া আদায় করতে হয় এ জন্যে যে, আমি অনুমতি চাইলে মওলানা নিতান্ত হাসি মুখে তা থেকে তথ্যাদি গ্রহণ এবং উদ্ধৃতি দেওয়ার অনুমতি দান করেন।

আবুল হাসনাত নদভী
দারুল মুসান্নিফীন, আযমগড়
১৮ জুলাই ১৯২২ সোমবার

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র

বর্তমান যুগে প্রতিটি জাতি বিশ্ব সভায় নিজেদের গুরুত্ব প্রমাণ করা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার নিমিত্ত অতীতের ইতিহাস এবং অতীত মনীষীদের কীর্তির বারবার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। একটি জাতি হিসাবে বিশ্ব সভায় মুসলমানদের যেটুকু মর্যাদা তার ভিত্তিও অতীত মনীষীদের উজ্জ্বল কীর্তির উপরই স্থাপিত। তারা যখন আরব থেকে বের হয়, তখন তাঁদের এক হাতে ছিল বিজয়ের তরবারি, আর অপর হাতে ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল, যে দেশই তাঁদের কর্তৃত্তাধীনে এসেছে সেখানেই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল প্রজ্জলিত করেছেন।

মুসলমানরা আরবের পুণ্য ভূমি থেকে বের হয়ে দুনিয়ার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ছড়িয়ে পড়াটা গোটা বিশ্বের জন্য ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। যেখানেই তাঁরা পৌঁছেছে সেখানের আসমান-যমীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা আন্দালুসের ভূমিতে তাহযীব-তমদ্দুনের আলো ছড়ায়, যাতে পাশ্চাত্যের ঘোর অমানিশা দূরীভূত হয়। তারা মিসর, ত্রিপোলী, আলজিরিয়া, মরক্কো এবং কায়রোয়ানের আফ্রিকান গোত্রগুলোকে শিক্ষা দিয়ে গুণগরিমার উচ্চাসনে আসীন করে। প্রাচ্যে ইরানকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারায় পরিণত করে। আন্দালুসের ইসলামী তমদ্দুন, ইরানে শীরাজ ও বাগদাদের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ আজও তাদের জাতীয় ইতিহাসের সোনালী কীর্তিরূপে বিবেচিত হচ্ছে। এবং অনন্তকাল ধরে, এভাবেই অম্লান থাকবে।

আল্লামা শিবলী নু'মানী তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধে শিক্ষা ক্ষেত্রে এ কীর্তির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মিসর, সিরিয়া, রোম, খুরাসান, ইরাক এবং আফ্রিকান মুসলমানরা যেসব মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন, আল্লামা মরহুম তাঁর অধিকাংশের নাম উল্লেখ করেছেন এবং সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমাদের স্বদেশ ভারত ভূমি সম্পর্কে এ যাবৎ কিছুই লিখা হয়নি। আল্লামা মরহুম প্রথম দিকে একথা স্বীকারই করতেন না যে, হিন্দুস্তানে মুসলমানরা ইসলামী মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছিল। "ইসলামী মাদ্‌রাসাসমূহ" শীর্ষক এক নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন ; "হিন্দুস্তানের আলোচনায় আমাদেরকে নির্দ্বিধায় বলতে হবে যে, এ দেশের মাটিতে শিক্ষা নিকেতনরূপে একটি ইমারতও স্থাপিত হয়নি। কিন্তু এরপর কোন কোন লেখক

দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আল্লামা মরহুম তাঁর এ মত পরিবর্তন করেন এবং দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত নিবন্ধের টীকায় লিখেন ঃ

"আমি স্বীকার করছি, আমার এ গবেষণা নির্ভুল প্রমাণিত হয় নি, ভারতে অনেক মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়েছিল, যদিও বর্তমানে সেগুলোর নাম-নিশানাও অবশিষ্ট নেই।"

এরপরও আল্লামা শিবলীর স্বীকারুক্তি দ্বারা আসল জঠ খুলেনি। আর এ আলোচনা সম্পর্কে কোন বিস্তারিত জ্ঞানও লাভ হয়নি। এ কারণে এ প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্রান্ত সকল তত্ত্ব-তথ্যের একত্র সমাবেশ করা ছিল নিতান্ত জরুরী।

সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত

সন্দেহ নেই যে, বিষয়টি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই কঠিন এবং শ্রম সাপেক্ষ। প্রথমতঃ এ শিরোনামের জন্য ফার্সী ভাষায় রচিত ইতিহাস পুস্তকসমূহে যেটুকু উপাদান পাওয়া যায়, তা এতই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যে, তাতে চোখ পড়াই কঠিন। দ্বিতীয়তঃ সে সব ইতিহাস গ্রন্থের রচনাভঙ্গি প্রাচীন ইতিহাস রচনার ধারায় হওয়ার ফলে তাতে বিগত কালের শিক্ষা, তমদ্দুন এবং রাজনীতির বিবরণ অনুসন্ধান করতে চাইলে ব্যর্থ মনোরথ হতে হবে। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থগুলোর বেশির ভাগই হচ্ছে রাজা-বাদশাহদের জীবনেতিহাস। এসব জীবনেতিহাসে বিশেষভাবে তাঁদের দেশ বিজয় এবং যুদ্ধের কৃতিত্বই সবিস্তারে আলোচিত হয়ে থাকে। এগুলোই ছিল সেকালের সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যণীয় ঘটনাবলী। এ কারণে ইতিহাসের পাতাও রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করেছে। আর এটা স্পষ্ট যে, অস্ত্রের ঝনঝনানী, ঢাকঢোল আর বিউগলের কর্ণবিদারী শোরগোল এবং যুদ্ধের প্রলয়ংকরী কোলাহলের মধ্যে দারস ও তালীমের ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যাবে কী করে?

এরপরও গভীর অভিনিবেশ সহকারে ইতিহাসের পাতাসমূহ অধ্যয়ন করলে রাজা-বাদশাহের জীবনেতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে প্রসঙ্গক্রমে অন্য ধরণের ঘটনাবলীও পাওয়া যায়, কোন ব্যক্তি তার পরিশ্রম অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত করলে অতীতকালের রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচারপদ্ধতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে ধারণা নেয়ার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে অনেক তথ্যই খুঁজে পাবে। বক্ষমান পুস্তকে আমি এ ধরণের অনুসন্ধানের ফসল পরিবেশনের প্রয়াস পেয়েছি। এটা কেবল ভারত বর্ষের জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা বিস্তারের তত্ত্বাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মূল বিষয়ে বক্তব্য শুরু করার আগে এমন কতিপয় সংক্ষিপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সমীচীন মনে হয়, যা থেকে জানা যাবে যে, প্রাচীন ফার্সী ইতিহাস গ্রন্থসমূহে ভারতবর্ষের অতীত মাদ্‌রাসাসমূহ সম্পর্কে স্বতন্ত্র অধ্যায় কেন পাওয়া যায় না।

উপরন্ত একমাত্র জানা যাবে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে সেকালে ব্যবহৃত ইমারত তার স্থানসমূহই বা কোন গুলো ছিল ?

১. ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষাস্থানকে সবসময় ধর্মীয় কর্তব্য এবং কল্যাণকর কাজ বলে বিবেচনা করেছে। শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা, শিক্ষার প্রসার, কিতাব এবং শিক্ষাস্থানের উপকরণ ওয়াক্‌ফ করা, মাদ্‌রাসা স্থাপন এবং আলিম ওলামা ও শিক্ষকের খিদমত সাহায্য-সহায়তা ইত্যাদিকে তারা ধর্মীয় অনুশাসন এবং দীন-দুনিয়ার কল্যাণের কারণ বলে জ্ঞান করতো। এ কারণে জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকের মতো এটিও তাদের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অংশে পরিণত হয়েছিলো। আর যেহেতু সচরাচর এক ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম তার জীবনেতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করার মতো বলে বিবেচিত হয় না, বরং সাধারণ কথায় জীবনের অন্যান্য ব্যাপারের সাথে ভাসাভাসাভাবে তারও উল্লেখ করা হয়ে থাকে একারণে প্রাচীনকালে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে উল্লেখযোগ্য কীর্তি সাধন করেছে প্রাচীন ঐতিহাসিকরা তা স্বতন্ত্র অধ্যায় পরিচ্ছদে বিবৃত করেন নি।

২. পাঠকমাত্রই ফার্সী ইতিহাস গ্রন্থসমূহে মুসলিম শাসকদের কর্মজীবন সম্পর্কে সাধারণতঃ এ কথাগুলো পাঠ করে থাকবেন ঃ

در عهد حکومت خود تالابها وچاه ها و پلهابستند، و در هر طرف دیگر عمارات و بقاع خیرنیز نبا نهارند

তিনি তাঁর শাসনকালে অনেক পুকুর, কুপ খনন করান এবং পুল নির্মাণ করান এবং অপর দিকে দেশের অভ্যন্তরে ইমারত ও অশেষ কল্যাণের স্থান প্রতিষ্ঠা করেন।

এ ধরণের বর্ণনায় সাধারণতঃ ইমারত আর কল্যাণকর স্থানের অর্থ হচ্ছে মক্তব-মাদ্‌রাসা মসজিদ এবং খানকা।

তারীখে মিরআতে আহমদী গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন গুজরাটের দেওয়ান বা কালেক্টর। এ পুস্তকের স্থানে স্থানে তিনি ফরমানের নকলও উদ্ধৃত করেছেন। এসব ফরমানের মধ্যে সকল সূবা বা রাজ্যের জন্য সম্রাট আকবরের জারীকৃত একটি ফরমানও রয়েছে। যার ৩০ নং ধারার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"সাধ্যমত দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার চালাতে হবে যাতে করে দুনিয়া থেকে জ্ঞানী-গুণীজন বিলীন হয়ে না যান বরং তাঁদের স্মৃতি ধরাপৃষ্ঠে বর্তমান থাকে।"

৩. পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বিস্তারিত জানা যাবে যে, প্রাচীনকালে শিক্ষার জন্য সারণতঃ স্বতন্ত্র ইমারত থাকতো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মসজিদ একাজে ব্যবহৃত হতো। তখনকার সকল মসজিদ দ্বারাই মাদ্‌রাসার কাজ চালানো হতো। এ কারণে সকল প্রাচীন বিশাল মসজিদ ছিল এক একটা বড় মাদ্‌রাসা। এ কারণে হিন্দুস্তানের

প্রাচীন মসজিদ শহরসমূহের স্থানে স্থানে প্রশস্ত ও শানদার মসজিদ দেখতে পাওয়া যায়। দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, জৌনপুর, গুজরাট প্রভৃতি প্রাচীন ইসলামী রাজধানী নগরসমূহে বড় বড় মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এবং সেগুলো এখনো টিকে আছে। সেগুলোর গঠন কাঠামো স্পষ্ট বলে দেয় যে, এসব মসজিদের বিরাট অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত হতো।এসব মসজিদের আঙ্গিনার চারিদিকে ছোট ছোট হুজরার বিস্তীর্ণ ধারা আজও দৃষ্টি গোচর হয়। আসলে এগুলো ছিল ছাত্র এবং শিক্ষকদের বাসস্থান। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি এখনো এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, ১০৬০ হিজরীতে নির্মিত দিল্লীর ফতেহপুরী মসজিদ এবং আকবরাবাদী মসজিদ। এ মসজিদদ্বয়ের বিস্তীর্ণ আঙ্গিনায় চতুর্দিকে যেসব কক্ষ নির্মাণ করা হয় তা বিশেষভাবে ছাত্রদের বাসস্থান ছিল। প্রথমোক্তটি এখানো এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজও সেখান থেকে আরবী শিক্ষার এক বিরাট ছাত্রদল ফয়েয লাভ করছে।

৪. প্রাচীনকালের খানকাগুলোও সাধারণতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাজে ব্যবহৃত হতো। তখনকার সূফী এবং হুজরার কোণে আশ্রয় গ্রহণকারী মাশায়েখরা কেবল নাফসের সাথে মুজাহাদা এবং ওযীফাকেই ইবাদত বলে মনে করতেন না বরং শরীআত তরীকত এবং যাহির-বাতিন উভয় ধরণের শিক্ষাদীক্ষাকে তাঁরা নিজের মৌল লক্ষ্য বলে মনে করতেন। এ কারণে প্রাচীন মাশায়েখ এবং বুযুর্গানে দীনের জীবনেতিহাসে দরস-তাদরীসের কাজ প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়, প্রতিটি খানকায় তাসাউফ ও বাতিনী ইল্‌মের শিক্ষার্থীদের মতো জাহিরী ইল্‌মের অন্বেষণকারী এক বিরাট দলও পাওয়া যেতো। খানকার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুদান বা ব্যক্তিদানরূপে প্রদত্ত ওয়াকফ্ সম্পত্তি থাকতো তার বিরাট অংশ ছাত্রদের জন্য ব্যয়িত হতো। এ কারণে প্রাচীন খানকাগুলোকেও মাদ্‌রাসা-মক্তবের পর্যায়ভুক্ত স্থান করতে হবে।

৫. রাজা-বাদশাহ এবং বুযুর্গানে দীনের কবরের উপর যে মাকবারা এবং রওযা নির্মিত হতো, সেসবের সঙ্গে আশপাশে অনেক হুজরা এবং কক্ষ এজন্য নির্মিত হতো যে, সেগুলো যেন মাদ্‌রাসার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। মাকবারায়ে হুমায়ূনী এবং আলীউদ্দীন সিরাজীর মাকবারা সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। বর্তমানেও দিল্লী, আগ্রা আহমদাবাদ বিজর প্রভৃতি স্থানে যেসব মাকবারা বর্তমান রয়েছে, সেগুলোর আকৃতিই ইতিহাসের কথা বলে দিচ্ছে।

এ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতের পর যে বিশেষ ইমারতগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, সেগুলো এ সিলসিলা থেকে ভিন্ন এবং মাদ্‌রাসা নামেই নির্মিত হয়। উপরন্তু এ প্রসঙ্গে আনুসঙ্গিকভাবে উপমহাদেশের বিভিন্ন জ্ঞানপীঠরূপী এসব এবং জনপদ সম্পর্কেও আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যার দ্বারা শিক্ষার ধারা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার-প্রসারের

রীতি পদ্ধতির উপর অতিরিক্ত আলোকসম্পাত হতে পারে। এটাও জানা যাবে যে, প্রাচীনকালের শিক্ষালয়ের অর্থ কতো ব্যাপক ও প্রসারিত ছিল। এসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের (যেমন ইতিহাস, তাযকিরা, মালফুজাত, মকতুবাত জাতীয়) গ্রন্থের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত বিবরণী থেকে।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন

হিজরী প্রথম শতকের শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটলেও সত্যিকার অর্থে তা গোটা দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারনি। অবশ্য হিন্দুস্তানের অন্ধপুরীর কোন কোন অঞ্চলে ইসলামের আলোর কিরণ ঐ সময়ই পড়েছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় সুলতান মাহমূদ গযনবীর জিহাদী প্রচেষ্টার কল্যাণে। এ কারণে তখন থেকেই এদেশে ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। সর্বপ্রথম হিজরী ৩৯০ সালে ভারত জয়ের প্রতি সুলতান মাহমূদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এরপর ধীরে ধীরে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বিপুল এলাকা ইসলামী পতাকার অধীনে আসে। ইসলামী বিজয়ের এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে, প্রথমে মুসলিম সৈন্যরা নিঃসন্দেহে তীর তলোয়ার হাতেই অগ্রসর হয় কিন্তু বিজয় লাভের পর তলোয়ার তাদের হাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকে না ; তখন তাদের হাতে পরিদৃষ্ট হয় জ্ঞানের বাহন। কিতাব আর কলম। এমনিভাবে তারা গোটাদেশে বিকীরণ করে জ্ঞানের আলো। আর বইয়ে দেয় গুণগরিমার ফল্গু ধারা। মহামতি সুলতান মাহমূদের রাজধানী ছিলো গযনী। উপমহাদেশের বিজিত এলাকার শাসন কাঠামো ছিল বর্তমান কালের প্রাদেশিক সরকারের শাসন কাঠামোর মত। তাঁর মনোনীত শাসন কর্তারা এখানে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। এসব শাসনকর্তাদের মর্যাদা ছিলো লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অনুরূপ। তৎকালীন ইসলামী সরকার শিক্ষাবিস্তারের জন্যে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এতটুকু জানা যায় যে, সুলতান মাহমূদ নিজে একজন জ্ঞানানুরাগী বিদ্যুৎসাহী ও আলিম-উলামা ভক্ত বাদশাহ ছিলেন। প্রচুর সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী ও কবি-সাহিত্যিক তাঁর দরবারে গমগম করতেন। দেশের অভ্যন্তরে মসজিদ মাদ্‌রাসা স্থাপনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। হিজরী ৪০৯ সালের পর সুলতান মাহমূদ যখন কনৌজ জয় করে গযনী ফিরে যান তখন তিনি সেখানে জামে মসজিদ এবং মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতা লিখেন ঃ

سلطان چوں بفتح و فیروزی ایں سفر مراجعت نمود فرمود، تادر غزنی مسجد جامع بنیاد نمودند – واصل عمارت مسجد ازسنگ مرمر در خام مربع و مسدس و متمن مدور بر آور دند بطر زیکه

بینیند گان مشانت و و طراحی آں متجر شدتد – و بعد از اتمام عمارت موجب حکم بنوع آں را بانواع زینت و فروش و قندیل مزین ساخسند که ظرفائے وقت آں مسجد را عروس فلك حی کفتند – ودر جوار آں مسجد مدرسه بنا نهاده و بتفاش کتب و غرائب نسبخ مو شح گرد انیده دهات بسیار بر مسجد و مدرسه وقف نموده –

"সুলতান এ সফর থেকে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি গযনীতে জামে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করার নির্দেশ দেন। মসজিদের মূল ইমারত নির্মাণ করা হয় মর্মর পাথর দিয়ে। চতুষ্কোন, ষষ্ঠকোণ, অষ্টকোণ বিশিষ্ট এবং গোলাকার পাথর সংগ্রহ করা হয়। এমন নিখুঁতভাবে স্থাপন করা হয় যে, তাতে দর্শকদের বিস্মিত হতে হয়। ইমরাতের নির্মাণ কার্য শেষে সুলতানের নির্দেশে নানা প্রকার সাজসজ্জা, ঝালর বাতি ইত্যাদি দিয়ে –সজ্জিত করা হয়। মসজিদকে এমনভাবে সজ্জিত করা হয় যে, তৎকালীন রসজ্ঞ ব্যক্তিরা মসজিদটিকে 'আকাশের বর' বলে অভিহিত করতেন। মসজিদের সন্নিকটে মাদ্‌রাসা নির্মাণ করে উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজি আর দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিসমূহ দ্বারা তা ভরে তোলা হয়। আর এসব মসজিদ মাদ্‌রাসার জন্যে অসংখ্য গ্রাম ওয়াক্‌ফ করা হয়।[১]

বাদশাহ্‌র এই ঝোঁক প্রবণতা লক্ষ করে তাঁর সভাসদ এবং পারিষদবর্গও তাঁর অনুকরণ-অনুসরণ করতেন। তাঁর রাজ্যে শিক্ষার কত প্রসার ঘটে থাকবে এসব দেখে যে কেউ তা সহজেই অনুমান করতে পারে। তাই উপরোক্ত আলোচনার পরপরই ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তা লিখেন ঃ

و بمقتضائے الناس علی دین ملوکهم هریکے ازامراء و اعیان دولت به بنائے مسجد و مدرسه در باغات و خوانق مبادرت نمودند –

"সাধারণ মানুষ তাদের রাজ-রাজড়াদেরই অনুসরণ করে যাবে" এ প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী সভাসদ এবং পারিষদবর্গের সবাই মসজিদ, মাদ্‌রাসা ইত্যাদি নির্মাণে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন।[২]

সুতরাং এহেন শাসকের শাসনামলে এদেশ শিক্ষার উপায়-উপকরণ শূন্য থাকবে এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। বারিপাত হলে প্রান্তর ও বাগান উভয়ই সমভাবে সিক্ত পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে।

এ থেকে আমি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই যে, ইসলামী শাসনামলে মসজিদের পাশাপাশি এখানে মাদ্‌রাসা এবং মক্তব প্রতিষ্ঠার ঝোঁক প্রবণতা সাধারণভাবে

সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আমার ধারণায় সুলতান মাহমূদের শাসন আমলেই এর সূচনা হয়েছে। সুলতান এবং তাঁর শাসনকর্তাদের মাধ্যমে এ নিয়ম সর্বপ্রথম এদেশে চালু হয়। পরে ধীরে ধীরে তা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ এবং স্বয়ং ফিরিশতার বর্ণনা থেকেও জানা যায় যে, হিন্দুস্তানের বাইরে সকল মুসলিম দেশে এ প্রথাই চালু ছিলো।

সুলতান মাহমূদের ইন্তিকালের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শিহাবুদ্দিন মাসঊদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মত তিনিও ছিলেন জ্ঞান বিদ্যোৎসাহী এবং জ্ঞানী গুণীদের পৃষ্ঠপোষক বাদশাহ্। জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে তিনি ছিলেন উদার হস্ত। অনেক আলিমই তাঁর নামে গ্রন্থ রচনা করেন। কাযী আবূ মুহাম্মাদ নাসেহী 'ফিকহে মাস'ঊদী' নামে হানাফী ব্যবহার শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। গণিত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত জ্যোতিবিদ আবূ রায়হান খাওয়ারযিমী 'কানূনে মাসউদী' (قانون مسعودی) রচনা করে যে ইনাম লাভ করেন ঐতিহাসিক ফিরিশতা সে প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

ابو ریحان خوارزمی منجم که علامة وقت بود در ریاضیات نظیرے نه داشت قانون مسعودی در علم ریاضی بنام او نوشت و نیلے از نقره صله یافت –

'জ্যোতিবিদ আবূ রায়হান খাওয়ারযিমী ছিলেন তাঁর সমসাময়িক আমলের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ব্যক্তি। অংক শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি 'কানুনে মাসউদী' নামে একটি গণিত পুস্তক রচনা করে একটি রৌপ্য নির্মিত হাতী ইনাম স্বরূপ লাভ করেন।'[৩]

তিনি তাঁর রাজ্যে অসংখ্য মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। ফিরিশ্‌তা লিখেন ঃ

در اوائل سلطنت او در ممالك محروسه چنداں مدارس و مساجد بنیادنهادندکه زبان از تعداد آں عاجز و قاصراست –

'তাঁর শাসনকালের প্রথম দিকে তিনি বিজিত এলাকায় এত বিপুল সংখ্যক মসজিদ মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন যে, তার সংখ্যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।'[৪]

পৌনে দু'শ বছর শাসনের পর হিজরী ৫৮০ সালে আমীর শিহাবুদ্দিন মুহাম্মাদ ঘোরীর হাতে খসরু মালিক ইবন খসরুশাহ গযনবীর পরাজয়ে ভারতের শাসনক্ষমতা গযনবী খান্দানের হাত থেকে ঘোরী খান্দানের হাতে চলে যায়।

আজমীরের মাদ্‌রাসাসমূহ

আমীর শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরী হিজরী ৫৮৭ সালে আজমীর জয় করেন। 'তাজুল মাআছির'[৫]। গ্রন্থের রচয়িতা হাসান নিযামী নিশাপুরীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরী আজমীরে অনেকগুলো মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এসব মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাকাল সঠিকরূপে নিরূপণ করা যায় না। অবশ্য অনুমান করা যায় যে, আজমীর বিজয়ের অব্যবহিত পরই সেখানে এসব মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়ে থাকবে। এ ভিত্তিতে বলা যায় যে, এসব মাদ্‌রাসা ছিলো তদানীন্তন হিন্দুস্তানের প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র।

দিল্লীর মাদ্‌রাসাসমূহ

এ যাবৎ ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালিত হত গযনী থেকে। আমীর শিহাবুদ্দীন ঘোরীর পর হিজরী ৫৮৯ সনে কুতুবুদ্দীন আইবেক ভারতের রাজধানী লাহোর থেকে স্থানান্তরিত করেন। কুতুবুদ্দীন আইবেকের পর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ দিল্লীতে হিজরী ৬০৭ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খাস রাজধানী দিল্লীতেই অনেকগুলো মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। নিশ্চিত করে বলা না গেলেও আলামত থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, দিল্লীর মশহুর মুইযযী মাদ্‌রাসা ছিলো এযুগেরই স্মৃতিবাহী শিক্ষাকেন্দ্র। সুলতান ইলতুতমিশ বাদায়ূনেও একটা মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন মুইয্‌যী নামক মাদ্‌রাসাটি স্থাপন করেন। ইলতুতমিশের মনিব সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর আসল নাম ছিলো মুইয্‌যুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী।যতদূর মনে হয় ইলতুতমিশ স্বীয় মনিবের নামে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাযিয়ার শাসনকালে কারামেতারা যখন দিল্লীর উপর হামলা চালায়, তাবাকাতই নাসিরীর বর্ণনামতে, তখন তারা এ মাদ্‌রাসা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। এটা ছিল হিজরী ৬৩৫ সালের ঘটনা। মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক বুখারী ছিলেন উক্ত মুইয্‌যী মাদ্‌রাসার অন্যতম শিক্ষক। ইনি ছিলেন সে কালের আলিমকূল শিরোমণি।

দিল্লীতে এ সময়কার আর একটা আযীমুশ্‌শান মাদ্‌রাসার সন্ধান পাওয়া যায়। এ মাদ্‌রাসার নাম ছিল মাদ্‌রাসা-ই-নাসিরিয়া। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের পুত্র নাসিরুদ-দুনায়া ওয়াদ্দীন-এর নামে এ মাদ্‌রাসাটি স্থাপিত হয়। তাবাকাত-ই নাসিরীর রচয়িতা সিরাজুদ্দীন আফীফ ছিলেন এ মাদ্‌রাসারই মুহতামিম বা অধ্যক্ষ। তিনি নিজেই লিখেন ঃ

در ماه شعبان سنه خمس و ثلثين و ستماة سلطانه رضيه مدرسه ناصريه در حضرت متضم باقصائے كاليور بدين داعى مفوض فرموض -

'সুলতানা রাযিয়া হিজরী ৬৩৫ সালের শা'বান মাসে কালিয়ূরের দূরবর্তী এলাকায় মাদ্‌রাসা-ই নাসিরিয়ার পরিচালনার দায়িত্বভার আমার হাতে ন্যস্ত করেন।'[৬] তাবাকাতে নাসিরী পৃ. ১৮৮ (এশিয়াটিক সোসাইটি কোলকাতা কর্তৃক মুদ্রিত)

আলাউদ্দীন খিলজীর মাকবারার মাদ্‌রাসা

এ মাদ্‌রাসাটি ছিলো মসজিদ-ই কুওয়াতুল ইসলাম এবং মসজিদ-ই কুৎব সাহেব এর ইট প্রস্তরাদির উঁচু স্তূপের নিকটে। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর ইন্তিকাল হয় হিজরী ৭১৫ সালে। এরপর সুলতান কুতুবুদ্দীন মুবারকশাহ খিলজী আনুমানিক হিজরী ৭১৭ সালে এ মাকবারা বা সমাধি ভবনটি নির্মাণ করেন। সুলতান ফিরোজশাহ তাঁর শাসনামলে মসজিদ, মাদ্‌রাসা এবং মাকবারার সংস্কার সাধন করেন। তিনি সমাধিতে চন্দন কাঠের ছাপ্পরখাট বানিয়ে দেন। মাদ্‌রাসাটি কখন স্থাপিত হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ যদি 'মাকবারাই আলাই'র তথা আলাউদ্দীন খিলজীর সমাধি ভবনের সাথে এটি নিমার্ণ করে থাকেন, তাহলে হিজরী ৭১৭ সালে এটি নির্মিত হয়ে থাকবে। আর মসজিদ-ই কুওয়াতুল ইসলামের সাথে এ মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়ে থাকলে এর নির্মাণকাল হবে হিজরী ৫৮৮ সাল। কারণ উক্ত সালেই কুতুবুদ্দীন আইবেক মসজিদটির ভিত্তি স্থাপন করেন। তারপর হিজরী ৬২৭ সালে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ মসজিদে তিন তিনটি মিহরাব সংযোজন করেন। মূল ইমারতের উঁচু ভিটায় তিনি পাঁচটা নতুন ধারা সংযোজন করেন। খুব সম্ভব এ সময়ই মাদ্‌রাসার ভিত্তিও স্থাপিত হয়েছে।

অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমার মতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগ আগ্রধিকার পেতে পারে। প্রথম যুগে অর্থাৎ কুতুবুদ্দীন মুবারক শাহ-এর আমলে কেবল মাকবারাটিই নির্মিত হয়েছিল।[৭]

সুলতান মুহম্মদ তুগলক যখন নতুন দিল্লী অর্থাৎ 'খুররম আবাদ' স্থাপন করেন, তখন মসজিদ-মাদ্‌রাসাও প্রতিষ্ঠা করা হয়। বদর চাচ এসব ইমারত নির্মাণের সন নির্দেশক একটা কবিতা রচনা করে পেশ করেন। উক্ত কবিতার কয়েকটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

برایں عمارت خرم برین خجسته سرامے

هزار دیده کشاداست چرخ ائینه دار

فناش نقش طرار نگار خانه خلد

هواش غالیه سائے نسیم باد و بهار

فضائے عرصه یکسر ستون بارگهش

لخیط نه ربض هفت قلعه دوار

چهار باز و ارکان او به پشتی بخت

ز روئے لطف سرعرش راگرفته کنار

رئیس مدرسة او معلم ادریس

امام مسجد او طوطے شکر کفتار

تمام گشت بتاریخ و اد خلوافیها

کشادہ باتو بگویم که هفصده وچل وچال

سنه ٧٤٤ هج

এ হেন মুবারক ইমারতে, এ মনোরম সরাইতে,
হাজার হাজার দশক আকাশের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন।
তার আঙ্গিনা জামাতে নয়নাভিরাম চিত্রমহলের নমুনা
তার পরিমণ্ডল ছাদ মূল্যবান, বসন্ত কালের মৃদুমন্দবায়ূর ছায়া।
তার দরবারের স্তম্ভ যেন এক বিশাল প্রান্তর,
চারিদিক বেষ্টন জুরে রয়েছে যেন সপ্ত প্রকাণ্ড দুর্গ।
তার চারি অঙ্গের চারিসহ ঊর্ধমুখী
তার মস্তক যেন আকাশকে স্পর্শ করছে।
তার বহির্ভাগ যেন উচ্ছল সৌম্যের মতো উদ্দাম,
তার ভেতরভাগ স্বচ্ছতায় মিক্‌র আর ইস্তিগাগের ঘৃষ্ম।
শিক্ষক ইদ্রিস হচ্ছেন এ মাদ্‌রাসার প্রধান,
এ মসজীদের ইমাম তোতা পাখির মতো মিষ্টভাষী।
সমাপ্ত হয়েছে তার নির্মাণ কার্য হিজরী ৭৪৪ সালে,
বলি তোমায় প্রবেশ করো তাতে।

উপরোক্ত শ্লোক থেকে জানা যায় যে, 'খুররমআবাদ' দুর্গের মসজিদ ও মাদ্‌রাসার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে হিজরী ৭৪৪ সাল।

হাওযে খাস (حوض خاص) নামে দিল্লীতে আর একটা প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা ছিল। মূলত ঃ হাওযটি নির্মাণ করেন সুলতান খিলজী। সুলতান তাঁর সিংহাসন আরোহণের বছর অর্থাৎ হিজরী ৬৯৬ সালে এটি নির্মাণ করেন। ফীরোজ শাহ-এর যামানায় হাওযটি ভরাট হয়ে যায়। ফীরোজ শাহ তা সংস্কার করেন এবং এর প্রয়োজনীয় মেরামত করেন। আনুমানিক হিজরী ৭৫৫ সালে হাওযের উপর একটা মাদ্‌রাসা

কায়েম করেন। এ মাদ্‌রাসায় তিনি খ্যাতিমান মুদাররিসগণের সমাবেশ ঘটান। সাইয়্যেদ ইউসুফ ইব্‌ন জামাল হুসাইনী ছিলেন এ মাদ্‌রাসার সদরুল মুদাররিসীন বা প্রধান শিক্ষক। হিজরী ৭৯০ সালে তাঁর ইন্‌তিকাল হলে মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গনে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাদ্‌রাসা-ই-ফীরূয শাহী

দিল্লীর এ মাদ্‌রাসাটি ছিলো সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং সে সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র। সুলতান ফীরূযশাহ দিল্লীর ফীরূয আবাদে হিজরী ৭৫৩ সালে এ মাদ্‌রাসাটি স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক যিয়া উদ্দীন বারানী এ মাদ্‌রাসার বর্ণনা দিয়েছেন দীর্ঘ কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে। তিনি লিখেন ঃ

یہ مدرسۃ اپنی شان و شوکت ، خوبی عمارت و موقع اور حسن انتظام و تعلیم کے لحاظ سے تمام مدارس ھند میں چسب سے بہتر اور عمدن ھے مصارف کیلئے شاھی و ظائف مقرر ھیں –

'শান শওকত-ইমারাতের সৌন্দর্য সৌকর্য, অবস্থান সুব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে এ মাদ্‌রাসাটি ছিল ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম মাদ্‌রাসা। এর ব্যয় নির্বাহের জন্যে শাহী অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে।[৮]

বর্ণনা ধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাদ্‌রাসার সাথে মসজিদও ছিল। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী ছিলেন এ মাদ্‌রাসার দীনিয়াতের মুদাররিস।

মাদ্‌রাসা-ই-বালাবন্দ আবসিরী

মূলতঃ একটি শাহী ইমারতে এ মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত ছিলো। যিয়াউদ্দীন বারানী লিখেন যে, ইমারতের সৌন্দর্য এবং অবস্থানের দিক থেকে দিল্লীর কোন ইমারত ফীরূযশাহী মাদ্‌রাসার সমকক্ষ হতে পারলে তা ছিল এ মাদ্‌রাসা-ই-বালাবন্দ আবসিরীর ইমারত। অতঃপর তিনি লিখেন ঃ

مولانا سید الائمہ والعلماء نجم الملۃ والدین سمرقندی کہ از نوادر اساتذہ است در ان عمارت مبارکہ مدرس گشتہ

'মাওলানা সাইয়্যেদুল আইম্যা ওয়াল 'উলামা নাজমুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন সমরকান্দীর মত অসাধারণ শিক্ষক এ বরকতময় ইমারতের উস্তাদ ছিলেন।'[৯]

মাদ্‌রাসার জন্যে কিছু ওয়াক্‌ফ সম্পদ এবং শাহী অনুদান নির্ধারিত ছিল। শিক্ষার্থীদের অনেককে ভরণ পোষণ দেয়া হতো। এসব শিক্ষার্থী উপরোক্ত উস্তাদের নিকট বিদ্যাভ্যাস করত।

সুলতান ফীরূযশাহ্ শাহ্যাদা ফতেহ্খানের ওফাতে হিজরী ৭৭৬ সালের সফর মাসে তাঁর সমাধির সাথে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে একটা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। শাহী অনুদানের দ্বারা এ মাদ্রাসার ব্যয়ভার নির্বাহ করা হত।

সম্রাট হুমায়ূনের শাসনকাল শুরু হয় আনুমানিক হিজরী ৯৩৫ সালে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে তিনি পূর্ববর্তী বাদশাহদের চেয়ে কম চেষ্টা করেননি। সম্রাট হুমায়ূন অত্যান্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভূগোলের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। রসায়ণ শাস্ত্রে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। একালে মাদ্রাসায় সাধারণত যেসব গ্লোব এবং অ্যাষ্ট্রলাব (Astrolabe) যন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়,সম্রাট হুমায়ূনই এদেশে তার প্রচলন করেন। তিনি এক বিশেষ ধরনের অ্যাষ্ট্রলাব উদ্ভাবন করেন, যা হুমায়ূনী অ্যাষ্ট্রলাব (اصطرلاب همايونى) নামে খ্যাত। দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌর গ্রন্থাগারে একটা অ্যাষ্ট্রলাব আছে, যার উপর নির্মাতার নিম্নোক্ত বাক্য খচিত আছে ঃ

عمل ضياء الدين محمد بن قاسم محمد بن ملا عيسى بن شيخ

الهداد اصطرلابى همايونى لاهورى فى سنه ٩٩٥ ه –

‘গিয়াসউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনি কাসিম মুহাম্মদ ইবন মোল্লা ঈসা ইবন শায়খ আল-হাদ্দাদ লাহোরী ৯৯৫ হিজরী সালে লাহোরে এ হুমায়ূনী অ্যাষ্ট্রলাবটি নির্মাণ করেন।[১০] -

সম্রাট হুমায়ূন দিল্লীতে একটা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এ মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন শায়খ হুসাইন। সাধারণতঃ মানুষ এটা জানেনা যে, হুমায়ূনের সমাধি ভবনের উপর যে ছাদ ছিল, আসলে তা'ছিল একটা মাদ্রাসা। সেকালের বড় বড় উস্তাদরা এ মাদ্রাসায় তালিম দিতেন। শিক্ষার্থীদের অবস্থানের জন্যে পাশে ছোট ছোট কক্ষ নির্মাণ করা–হয়েছিল।[১১]

সম্রাট আকবরের দুধমাতা মাহাম বেগম আকবরের শাসনামলে দিল্লীর পুরাতন কেল্লার নিকটে পশ্চিম দরজার বিপরীত দিকে একটা মসজিদ এবং মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। মাদ্রাসাটির নাম দেওয়া হয় খাইরুল মানাযিল (خير المنازل) উক্ত মাদ্রাসার ইমারত প্রাচীরে নিম্নোক্ত কবিতাংশটি খচিত ছিল ঃ -

بدوران جلال الدين محمد

كه باشد اكبر شاهان عادل

چو ماهم بيگم عصمت بناهى

بنا کرد ایں بنا بہر افاضل

ولے شد ساعی ایں بقعه خیر

شہاب الدین احمد خان باذل

زہے خیریت ایں خیر منزل

که شد تاریخ او خیر المنازل

জালালুদ্দীন মুহাম্মদ-এর শাসনামলে,
যিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ
মাহাম বেগমের মতো মহিয়সী রমনী,
বিজ্ঞজনদের জন্য নির্মাণ করান এটা।
অবশ্য এজন্য প্রচেষ্টা চালান শিহাবুদ্দীন আহমদ।
যিনি ছিলেন খানদের মধ্যে দানশীল।
এ উত্তম মনযিলের কল্যাণ অব্যাহত থাকুক,
কারণ, তার নির্মাণ তারিখ হচ্ছে 'খাইরুল মানাযিল ৯৬৯।

সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহনের অষ্টম সালে তাঁর উপর আক্রমনের যে চেষ্টা চালানো হয়, এটা প্রায় সে সময়ের ঘটনা। এখন কেবল মাদ্‌রাসাটির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। এ ধ্বংসাবশেষও তার অতীতের শান-শওকতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস-ই- দেহলভী তাঁর 'আখবারুল আখইয়ার' (اخبار الاخيار) গ্রন্থে একটা মাদ্‌রাসার উল্লেখ করেছেন, যাতে তিনি নিজে বিদ্যাশিক্ষা করেছেন। এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষা দানের সময় ছিল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এবং যোহরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। শায়খ আব্দুল হক দৈনিক দুইবার তাঁর বাসস্থান থেকে উক্ত মাদ্‌রাসায় যেতেন।

দিল্লীর জামে মসজিদই সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে স্থাপত্য শিল্পের একমাত্র নিদর্শন নয় এবং এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ইমারতও ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইংরেজ ঐতিহাসিক জর্জ স্টিফেন লিখেছেন, মসজিদের উত্তর দিকে ছিল শিফাখানা। এখানে গরীব মিসকীনদের চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা ছিলো। বিনামূল্যে তাদের চিকিৎসা করা হতো এবং ঔষধপত্র দেয়া হতো। মসজিদের দক্ষিণ দিকে ছিল শাহী মাদ্‌রাসা। আনুমানিক হিজরী ১০৬০ সালে এ মাদ্‌রাসাটি নির্মাণ করা হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের অনেক আগেই মাদ্‌রাসাটি কালের

করাল গ্রাসে বিরান হয়ে যায়। এ আযীমুশ্‌শান মাদ্‌রাসাটির নাম ছিল দারুল বাকা (دار البقاء)।

সম্রাট বাহাদুর শাহের শাসনামলে দিল্লীতে আর একটি নতুন মাদ্‌রাসা স্থাপন করা হয়। এ মাদ্‌রাসাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমীর গাযী উদ্দীন খান ফীরূযজংগ। হিজরী ১১২০ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের পর এ মাদ্‌রাসার প্রাঙ্গণেই তাঁকে দাফন করা হয়। আমীর গাযী উদ্দীন ছিলেন দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদের মামলাকাতে আসিফিয়ার প্রতিষ্ঠাতা নবাব আসিফ জাহ্-এর পিতা। জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক এ খান্দানের ফয়েয আজও হিন্দুস্তানের দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে এবং আলো বিকীরণ করছে। আমীর গাযীউদ্দীন ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের নির্ভরযোগ্য ও স্নেহ ভাজন আমীরদের অন্যতম। ইনি শাহী দরবারেরও অন্যতম সদস্য ছিলেন। আমীর গাযীউদ্দীন এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন আজমীরী দরওয়াযার নিকটে। মাদ্‌রাসার ইমারতের নিকটে একটি মসজিদও তিনি স্থাপন করেন। এ মাদ্‌রাসাটির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনো একটি সুদৃশ্য দরজা অবশিষ্ট রয়েছে। যা এমন একটা স্থানে নিয়ে যায়, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এটা ছিলো মাদ্‌রাসার বাবুর্চি খানা। লক্ষ্ণৌর নবাব এতেমাদুদ্দৌলা ফযল আলী খান এ মাদ্‌রাসাটির ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে দান করেন। কোম্পানীর পক্ষ থেকে মাদ্‌রাসার প্রাচীরে একটা শিলীলিপি স্থাপন করা হয়। যাতে লিখিত ছিলো ঃ

نه بر لوح نقشے بماند ولیك –
جزاء عمل وماند قام نیك

'পাথর গাত্রেও কোন চিহ্ন থাকে না,
থাকে কেবল কর্মফল আর সুখ্যাতি।

بیاد حسنات نواب اعتماد الدوله ضیاء الملك سید فضل علیخان بهادر سهراب جنگ که یك لك وهفتادهزار روپیه برائے ترقی علوم دو مدرسه هذا واقع دهلی خاص مولود و وطن خویش بصاحبان کمپنی انگریز بهادر تفویض نموده اند منقوش گردیده سنه ۱۸۲۹ع۔۔

'নবাব এতেমাদুদ্দৌলা যিয়াউল মুলক সাইয়্যিদ ফযল আলীখান বাহাদুর সোহরাব জঙ্গ এর পবিত্র স্মৃতি স্মরণে, যিনি দিল্লীতে অবস্থিত এ মাদ্‌রাসায় জ্ঞানের উন্নতিকল্পে ইংরেজ বাহাদুর কোম্পানীর হাতে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা দান করেছেন। তার স্মৃতিতে এ ফলক খচিত হয়েছে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে।'

মুহাম্মদ শাহ-এর শাসনামলে নওয়াব শরফুদ্দৌলা ইরাদত খান একটা মাদ্‌রাসা এবং তার পাশে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। মাদ্‌রাসাটি স্থাপিত হয় হিজরী ১১৩৫ সালে। এ মসজিদে এ শিলালিপিটি স্থাপিত হয়েছে ঃ

در زمان شه خورشید سریر

ظل حق ماه زمین شاه زمان

ناصر الدین محمد شاه است

تیغ او کفر شکن در دوران

شرف الدوله بنا فرموده است

مسجد و مدرسه عالی شان

این دو بیت الشرف علم و عمل

پهچو سعدین فلك کرده قران

সিংহাসন-রবি বাদশাহ্‌র আমলে
যিনি আল্লাহ্‌র ছায়া, যমীনের চন্দ্র, যমানার বাদশাহ্।
তিনি নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ,
তাঁর তরবারী যামানার কুফর বিনাশকারী।
শরফুদ্দৌলা ভিত্তি স্থাপন করেছেন
আলীশান মসজিদ ও মাদ্‌রাসার।
এ দুটি হচ্ছে ইল্‌ম ও আমল-এর বায়তুশ্ শরফ বা মর্যাদাপূর্ণ দু'টি ভবন
যে দু' সা'দ আকাশের মিলন ঘটিয়েছেন।'
সে দু'-এর ন্যায়।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয় দিল্লীর মাদ্‌রাসা-ই-রহীমিয়ার কথা। সবশেষে উল্লেখ করলেও এ মাদ্‌রাসাটির কল্যাণ সুদূর প্রসারী। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস-ই দেহলভী-এর পিতা ফতোয়া-ই-আলমগীরীর অন্যতম সংকলক শাহ আব্দুর রহীম দেহলভী এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্, কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী; শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, শাহ ইসহাক, শাহ আব্দুল কাদির (র) প্রমুখ উলামায়ে কেরাম এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষালাভ করেন। এবং পর্যায়ক্রমে এর মুদারিসের পদেও নিযুক্ত হন। ফয়েযের এ ঝর্ণাধারা থেকেই ভারতের হাদীস-ই-নববীর ইলম ও বরকত দিকে দিক ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লীতে এ মাদ্‌রাসার ধ্বংসাবশেষ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।

পাঞ্জাবের মাদ্‌রাসাসমূহ

মুসলিম শাসনামলে পাঞ্জাবের রাজধানী ছিলো লাহোর। মুসলমানদের শাসনকালে শহরটির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। পৌনে দু'শ বছর পর্যন্ত লাহোর ছিলো গজনবী খান্দানের শাসকদের রাজধানী। শহরটি ছিলো জ্ঞানী-গুণীদের পীঠস্থান। দুঃখের বিষয়, এ শহরের মাদ্‌রাসাগুলোর নাম সুনির্দিষ্ঠভাবে জানা যায় না। অবশ্য শহরটিতে জ্ঞানের উন্নতি উৎকর্ষের নিদর্শন প্রমাণ করে যে, ইলমের চর্চায়ও শহরটি দীর্ঘ কাল ধরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পীঠস্থান ছিল।

লাহোর

উযীর খান মসজিদ ঃ এই মশহুর মসজিদে মাদ্‌রাসারও কাজ চলতো। মসজিদের নীচে এবং আশপাশে দোকান ছিলো। এসব দোকানের আমদানী দিয়ে যাতে স্বচ্ছন্দে দু'জন আলিম শিক্ষক নিয়োগ করা যায় এটাই ছিল প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য।[১২]

বাদশাহ আলমগীর আওরঙ্গজেবের শাসনকালে শিয়ালকোটের ইল্‌মী শান-শওকত সম্পর্কে জানা যায়। এ শহরটি তখন জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। এখানে বড় বড় মশহুর আলিম ছিলেন। আমাদের আরবী মাদ্‌রাসাসমূহের বালকরা পর্যন্ত মোল্লা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটীর নাম জানে। হিন্দুস্তান থেকে কনষ্টান্টিনোপল পর্যন্ত তাঁর লিখিত গ্রন্থরাজি ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর পরে তাঁর পুত্র মোল্লা আব্দুল্লাহ পিতার স্থানে শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু অতি দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠাকাল এবং অন্যান্য বিষয় বিস্তারিত জানা যায় না। সম্রাট আকবরের শাসনকালের পর থেকে শিয়ালকোট যে জ্ঞান পীঠে পরিণত হয়েছিল, তার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায় যে, সেখানে অনেক পূর্ব থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল।

খুলাসাতুত তাওয়াবীখের[১৩] রচয়িতা ভারতবর্ষের ভৌগলিক বিবরণ প্রসঙ্গে শিয়ালকোট সম্পর্কে লিখেন ঃ

و در ان خطه دلکشاخوا بگاه امام علی الحق خلف امام زین العابدین است گویند که بسیارے ازاهل اسلام از غرب بقصد جهاد در هندوستان آمده، باتفاقیے که روداد بسیالکوٹ رسیده باهنود جنگ کرده درجه شهادت یافتند ، اکوں مزار مظهر انوار ایشاں زیار تگاه صغار و کبار است، در آں شهر فیض آمود در العلم و جامع علماء معدن فضل و مسکن فضلاء واست اگرچه در زمان محمد اکبر

پادشاه زبده ارباب حال و قال مولينا كمال از حسين خان مر زبان كشمير رنجيده در سنه هفتصد وهفتاد ويك هجرى به سيالكوٹ رسيده بدرس طلبه علم اشتغال ورزيده رواج علم در آں شهر داده – اما در عهد خلافت شاهجهان بادشاں افضل الفضلاة واكمل الكملاء مظهر طبع مستقيم مولوى عبد الحكيم كه بحرمواج فضل و كمال و در فضائل وافادت بے همال است بيشتر موج علم گرديد و بربعضے كتب حاشيه تصنيف نموده محلل معانى مشكلة گرديده و طلبة علم ان ممالك دور و نزديك در مدرسه ايشان رسيده قيضياب شدند – وبعد رحلت ايشان مقتدائے اهل الله رهنمائے خلق الله مولوبى عبد الله خلق دوئمى آں مغفور مرونق افزائى مدرسة و رهنمائى طلبة علم استغال ورزيده فضائل معنوى رابا علوم صورى همدوش و درويشى را بافضيلت هم آغوش :گردانيده – ازافزونى حسين اخلاق و رهنموئى طبقات خلايق ايں بزرگ را امام وقت مى گفتند در سنه ٢٦ عالمگيرى بعلم جاويدى شتافت –

'এ মনোরম ভূমি ইমাম যয়নুল আবেদীনের পুত্র ইমাম 'আলীউল হক-এর অন্তিম শয়নস্থল। কথিত আছে যে, আরব থেকে অনেক মুসলমান জিহাদের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান আগমন করেন। শিয়ালকোটে পৌঁছে হিন্দুদের সাথে যুদ্ধ করে এদের অনেকে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। তাঁদের দীপ্তিময় মাযারসমূহ ছোট বড় নির্বিশেষ সকলের যিয়ারতের স্থান। এ ফয়েযপূর্ণ শহরটি হচ্ছে বিদ্যানিকেতন 'আলিম-ফাযিলদের আবাসভূমি এবং জ্ঞান গরিমার খনিস্বরূপ। যদিও সম্রাট আকবরের শাসনকালে হিজরী ৭৭১ সালে কাশ্মীরের সামন্ত হুসায়ন খানের দুর্ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে কাশ্মীর থেকে মওলানা কামাল শিয়াল কোটে পৌঁছে ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করেন এবং এ শহরে জ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করেন। পরবর্তীকালে বাদশাহ শাহজাহানের শাসনামলে মৌলভী আবদুল হাকীম জ্ঞানের বহুল চর্চা শুরু করেন। তিনি ছিলেন আফযালুল ফুযালা আকমালুল কুমালা জ্ঞানগরিমার তরঙ্গ সঙ্কুল সাগর, অতুলনীয় চারিত্রিক সুষমার অধিকারী জ্যোতির্ময় মহামানব। তিনি অনেক কিতাবের

টীকা টিপ্পনী লিখে দুর্বোধ্য বক্তব্যসমূহকে সহজ বোধ্য করেন। দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ছাত্র তাঁর মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট থেকে ফয়েয লাভ করে ধন্য হতো। তাঁর ইন্তিকালে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আল্লাহ্ ওয়ালাদের অনুসরণীয় এবং সৃষ্টিকূলের পথ প্রদর্শক মৌলভী আব্দুল্লাহ মাদ্রাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করে ছাত্রদের শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করেন। যাহিরী ইল্‌মের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক ইল্‌ম এবং সূফীবাদের সমাবেশ ঘটান তিনি। সুন্দর স্বভাব-পবিত্র আর বিপুল সংখ্যক মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে এ বুযুর্গকে ইমাম-ই-ওয়াক্ত বা 'যুগের ইমাম' বলে অভিহিত করা হতো। বাদশাহ আলমগীরের সিংহাসনে আরোহণের ২৬তম বর্ষে তিনি নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে অবিনশ্বর জগতের যাত্রী হন।'

শায়খ চিল্লির দরগাহ

পাঞ্জাবের থানেশ্বর অঞ্চলে শায়খ চিল্লির দরগাহর নিকটে একটা মাদ্রাসা ছিল। মাদ্রাসাটিও শায়খ চিল্লির মাদ্রাসা নামে মশহুর ছিল। মাদ্রাসার ইমারত ছিল ১৭০ বর্গ ফুট। এর চারদিকে নয়টি করে দরজা এবং পূর্ব দিকে দরজা ও সিঁড়ি ছিল। দরজাগুলো হিন্দুয়ানী ধরনের। শিখেরা শক্তি অর্জন করে শায়খ চিল্লির দরগাহকে মন্দিরে পরিণত করলে এই ইমারতে 'গ্রন্থ সাহেব' রাখা হয়। ইমারতটি এখন ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। এর সংস্কার প্রয়োজন। আছরিয়্যাত-ই-হিন্দ (اثریات هند)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হিজরী ১০৭১ সাল মুতাবিক ১৬৬১-ঈসায়ী সালে দারাশিকো এ মাদ্রাসাটি নির্মাণ করেন।[১৪]

নারনোল

শেরশাহ নারনোলে একটা মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। বর্তমানে এ স্থানটি এখন পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। হিমার ও জয়পুর রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যখানে বাওয়াল নামক স্টেশন থেকে ৩২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। মাদ্রাসাটির ইমারত ছিল অতি শানদার, শেরশাহের পিতামহ ইব্রাহীম সূর-এর কবর এখানেই অবস্থিত। মাদ্রাসাটির ইমারতে স্থাপিত একটা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মাদ্রাসাটি হিজরী ৯২৭ সালে নির্মিত। মাদ্রাসা এবং মাকবারার নির্মাণের ব্যয় হয়েছে একলক্ষ টাকার বেশি। শেরশাহের শাসনকালের আগে তাঁর পিতামহের ইন্তিকালে একটি পুণ্যকর্ম হিসাবে তিনি নিজে এ মাদ্রাসাটি স্থাপন করেন।[১৫]

আগ্রার মাদ্রাসাসমূহ

মুসলিম শাসনামলে শহরটি নানা দিক থেকে প্রভূত উন্নতি লাভ করে, যা অন্য কোন শহর লাভ করতে পারেনি। শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকে শহরটি দীর্ঘকাল ধরে

গর্বের ধন ছিল। আগ্রায় ছিল অনেক গুলো মাদ্রাসা। এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে ইরানের শীরায থেকে শিক্ষকদের আনা হত। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পরও বেঁচে ছিলেন, এমন একজন হিন্দু লেখক লালা সায়ল তাঁর গ্রন্থ –'তাফরীহুল ইমারাত' এ লিখেন যে, তার সময় পর্যন্ত আগ্রায় একটা বড় মাদ্রাসা বর্তমান ছিল। এ মাদ্রাসায় অধ্যাপনার জন্যে শীরায থেকে একজন 'আলিম আনীত হন। স্বয়ং লেখকের ভাষায় ঃ

در عهد جلال الدین محمد اکبر شاه جابجا مدرسه ها بودند
استادان فارس و شیراز تعلیم می فرمودند - چنانچه تا حال مدرسه
عالی اساس که رونق افزائے بوستان سخنور یست و دیباچه صحیفه
سخنوریست رریں دار الخلافت غطمت اساس وبمشاهده مکاناقش
تخم حیرت در ویده قریب می کارد -

'জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবর শাহ্-এর শাসনামলে স্থানে স্থানে মাদ্রাসা ছিল। পারস্য ও শীরাযের গুস্তাদগণ এসব মাদ্রাসায় তালিম দিতেন। বিশাল মাদ্রাসা ছিল কথা শিল্পীদের বাগানের রওনক-তাঁদের গ্রন্থের ভূমিকা। এ রাজধানীতে এসব মাদ্রাসার ভিত ছিল সুদৃঢ়। বর্তমানকাল পর্যন্ত তা বহাল তবিয়তে বিদ্যমান রয়েছে। এ মাদ্রাসার ইমারত দেখে দশর্ককে বিষ্ময়াভিভূত হতে হয়।'[১৬]

বর্তমানে মাদ্রাসার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। মাদ্রাসার স্থানে বর্তমানে গড়ে উঠেছে এক বিরাট মহল্লা। অবশ্য একটা চিহ্ন এখনো বর্তমান রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, মহল্লাটি এখনো মাদ্রাসা মহল্লা নামে পরিচিত। বাদশাহ আকবর এ মাদ্রাসার জন্যে শীরায থেকে চল্সী ভরণ নামক জনৈক পণ্ডিতকে আনান। বিজ্ঞ আবুল ফযল-এর প্রথম দফতরে তাঁকে তলবের ফরমানের উল্লেখ রয়েছে।

পদ্য ও গদ্য রচনায় বিশেষ পারদর্শী শায়খ যয়নুদ্দীন খানী আগ্রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এ মাদ্রাসার ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করতেন। ৯৪১ হিজরী মুতাবিক ১৫৩৪ ঈসায়ীসালে চুনার-এর নিকটে তাঁর ইন্তিকাল হলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঐ মাদ্রাসার আঙ্গিনায়ই তাঁকে দাফন করা হয়। এটা ছিল সম্রাট হুমায়ূনের আমলের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা।[১৭]

আকবরের শাসনকালে আগ্রার যে উন্নতি অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামল পর্যন্ত, তা অব্যাহত ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর 'তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী'তে লিখেন ঃ

'কারীগর ও জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের দ্বারা আগ্রার জনবসতি পরিপূর্ণ। সকল ধর্ম মতের পণ্ডিতগণ এ শহরে বর্তমান।'

বাদশাহ জাহাঙ্গীর আইন প্রণয়ন করেছিলেন ঃ

'দেশের সীমার মধ্যে কোথাও কোন ধনী ব্যক্তি বা কোন ব্যবসায়ী লা-ওয়ারিশ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে তার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সরকারের হাতে হস্তান্তরিত হয়ে মাদ্‌রাসা এবং খানকাসমূহের কাজে ব্যয়িত হবে।'[১৮]

জামে জাহান (جام جهان) গ্রন্থের রচয়িতা লিখেন যে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণের পর প্রাচীন মাদ্‌রাসাগুলোকে ছাত্র শিক্ষকে ভরে তোলেন। এসব মাদ্‌রাসা ইতি পূর্বে পশুপাখির আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। শরহে আকাইদে নসফীর হাশীয়া বা টীকাকার (حاشیه بر شرح عقائد نسفی) মওলানা আলাউদ্দীন লারী আগ্রায় তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায় দরস দিতেন। এ মাদ্‌রাসাটির নাম ছিল মাদ্‌রাসা-ই খস (مدرسة خس) এটাই তার প্রতিষ্ঠা সন নির্ধারক নামও বটে। ঐতিহাসিক মোল্লা বদায়ূনী লিখেন ঃ

با گره آمده بدرس مشغول شدند و مدرسه از خس ساختند و مدرسه خس تاریخش شد –

'তিনি আগ্রায় এসে দরসে মশগুল হন। খস দিয়ে একটা মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। মাদ্‌রাসাটির তারিখ নির্ধারক নাম 'মাদ্‌রাসা-ই-খস' (ঘাসের মাদ্‌রাসা)।'[১৯]

আগ্রার জামে মসজিদ সম্রাট শাহ জাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহান আরা বেগমের স্মৃতিবাহী। জাহানারা বেগম মসজিদের সাথে একটা মাদ্‌রাসাও স্থাপন করেন। মাদ্‌রাসাটি অত্যন্ত সফলতার সাথে দর্ঘিদিন চালু ছিল। কোন না কোনভাবে সম্ভবতঃ এখনো তা'টিকে আছে। মসজিদের আশপাশের দোকানের আমদানী মসজিদ মাদ্‌রাসার জন্যে ওয়াক্‌ফকৃত। আগ্রায় যে বিপুল সংখ্যক মাদ্‌রাসা ছিল, মহল্লাগুলোর নাম প্রাচীন ইমারত এবং লোক মুখে প্রচলিত মশহুর কিংবদন্তীসমূহ থেকে আজও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অন্যান্য মাদ্‌রাসাগুলোর সাথে বিয়ানার মাদ্‌রাসাও উল্লেখযোগ্য। মওলভী কাযী রফিউদ্দীন সাহেব কাযীর মসজিদের নিকটে এ মাদ্‌রাসাটি কায়েম করেন। মাদ্‌রাসার ইমারতের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মাদ্‌রাসাটি হিজরী ১০৮০ সালে স্থাপিত হয়।[২০]

ফতেহপুর সিক্রীর মাদ্‌রাসাসমূহ

সম্রাট আকবরও তাঁর শাসনকালে অনেকগুলো মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। ফতেহপুর সিক্রীতে পাহাড়ের উপর তিনি একটা বিশাল মাদ্‌রাসা কায়েম করেন। পর্যটকরা এর

অনুরূপ কোন মাদ্‌রাসার নাম খুব কমই বলতে পারেন। লালা সায়ল চন্দ তাঁর 'তাফরীহুল ইমারাত' গ্রন্থে নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা সম্ভবতঃ এ মাদ্‌রাসাটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ঃ

اکبرنے اجمیر سے واپس أکر فتحپور سکری کو اپنادار السلطنت بنایا، یہاں بہت سی عمارتیں بنوائیں - جن میں مدرسہ و خانقاہ وغیرہ بھی داخل ہیں -

'আকবর আজমীর থেকে ফিরে এসে ফতেহপুর সিক্রীকে তাঁর রাজধানী করেন। এখানে তিনি অনেকগুলো ইমারত নির্মাণ করেন। মাদ্‌রাসা, খানকা ইত্যাদিও এসবের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।'[২১]

আইন-ই-আকবরীতে উক্ত হয়েছে ঃ

بفرمانِ گیہانِ خدا مسجدے و مدرسہ و خانقا ھے برقراز آں کوہ انجام یافت - جہاں دیدگاں بداں نمطکم نشان دھند (ذکر دار الخلافۃ صوبہ دم گرہ)

'তিনি ফরমান বলে পাহাড়ের চূড়ায় মসজিদ মাদ্‌রাসা এবং খানকা নির্মাণ করেন। বিশ্বপর্যটকরা অনুরূপ ইমারত খুবই কম দেখে থাকবেন।'[২২]

এখানে মাদ্‌রাসা-ই-আবুল ফযল নামে একটা মাদ্‌রাসা ছিল। প্রতিষ্ঠাতার নেক নিয়তের ফলে এখন পর্যন্ত মাদ্‌রাসাটি টিকে আছে। মাদ্‌রাসাটি শাহী মহলের ইমারতের অতি নিকটে অবস্থিত। এছাড়া ফতেহপুরে আরো অনেক মাদ্‌রাসার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এসব মাদ্‌রাসার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না বিধায় আমরা সেগুলোর উল্লেখ করছি না।

মথুরা ও নরওয়া'র মাদ্‌রাসাসমূহ

সিকান্দার লোদী তাঁর শাসনামলে দেশে অনেক সরাইখানা, মসজিদ এবং মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন শরীআতের অত্যন্ত পাবন্দ এবং বিদ্যোৎশাহী শাসনকর্তা। তাঁর শাসনকাল থেকেই হিন্দুরা ফারসী ভাষা শিক্ষা করা শুরু করে।[২৩] তারিখে দাঊদী এবং জামে জাহানুঁমা থেকে জানা যায় যে, মথুরায় তিনি অনেকগুলো মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এসব মাদ্‌রাসার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না।

হিজরী ৯১৪ সালে সিকান্দার যখন মালওয়া অঞ্চলের নরওয়ার দুর্গ জয় করতে মনস্থ করেন এবং দীর্ঘ আটমাস নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলে এ ব্যাপারে সফলতা লাভ

করেন তখন ছয় মাস তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি মসজিদ মাদ্‌রাসার নির্মাণ কাজে নিয়োজিত থাকেন। ঐতিহাসিক কাশিম ফিরিশ্‌তার ভাষায় ঃ

و سلطان شش ماه در هائے قلعه نشته هتخانها را برانداخت و مساجد بنا نموده مفتی و خطیب تعین - فرموده و علماء و طلبه را و ظائف مقرر ساخته در آں جامتو طن گردانید -

'সুলতান ৬ মাস কেল্লার পাদদেশে বসে দেবালয়গুলো ভেঙ্গে ফেলেন। স্থানে স্থানে মসজিদের নির্মাণ করে মুফতী এবং খতীব নিযুক্ত করেন। 'আলিম জ্ঞানী-গুণী এবং ছাত্রদের জন্যে বৃত্তি নির্ধারণ করে তাদেরকে সেখানে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন।'[২৪]

বাদায়ুনের মাদ্‌রাসাসমূহ

প্রাচীনকাল থেকে এ শহরটি পাঠান আমীর-ওমরা এবং শাহজাদাগণের নিবাস স্থান ছিল। এ শহরের শিক্ষা -দীক্ষার ইতিহাস দিল্লী আগ্রার মতই উজ্জ্বল। কিন্তু আজ এর ঐতিহাসিক বিবরণ অজ্ঞাত। এসব সত্ত্বেও সেখানে সর্বদা আলিম-ফাযিলের উপস্থিতি এবং ছাত্রদের ভীড় তার অতীতের গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মিঃ ফ্রাংকলিন কর্তৃক প্রকাশিত শাহ্ আলামের ইতিহাস (تاریخ شاه علام) গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

بداپون کے قدیم عمارتوں کے ویران و منهدم حصے جو ابتك باقی هیں - وه در اصل باغوں ، مسجدوں، خانقاهوں اور قدیم مدرسوں کے آثار باقیه هیں -

'বদায়ূনের প্রাচীন ইমারতসমূহের ও ধ্বংসাবশেষসমূহের এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। মূলতঃ সেগুলো হচ্ছে বাগান, মসজিদ, খানকা এবং প্রাচীন মাদ্‌রাসাসমূহের ধ্বংসাবশেষ।'[২৫]

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের শাসনামলে হিজরী ৬২০ সালে বদায়ূনের জামে মসজিদ নির্মিত হয়।

এ মসজিদের পেছনে ছিল মাদ্‌রাসাই-মুইয্‌যী। নিশ্চিত করে বলা না গেলেও নানা কারণে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত ঃ এ দুটো ইমারত সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের স্মৃতিবাহী।

মাদ্‌রাসা দারানগর

আমরোহার আশপাশে এটা একটা মশহুর এলাকা। নজীবুদ্দৌলা এখানে একটা বিরাট মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। অসংখ্য ছাত্র এ মাদ্‌রাসা থেকে জ্ঞান লাভ করে। এ মাদ্‌রাসার শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন ফিরিঙ্গী মহলের শিক্ষাপ্রাপ্ত।

রামপুর মাদ্‌রাসা

নওয়াব ফয়যুল্লাহ্ খান মওলানা বাহ্‌রুল উলূমকে রামপুরে নিয়ে আসেন। আলিয়া মাদ্‌রাসায় যা এখনো বর্তমান রয়েছে–তাতে তিনি তাঁকে সদরুল মুদাররিসীন বা প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। মওলানা সেখানে ৫ বছর শিক্ষাদান করেন। হিন্দুস্তানের আর একজন মশহুর আলিম মোল্লা হাসানও দীর্ঘ দিন রামপুর আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক ছিলেন। এসব বুযুর্গদের ফয়যের বরকতে সেখানে জ্ঞানের চর্চা হয় প্রচুর।

শাহ্‌জাহানপুর ও বেরিলীর মাদ্‌রাসাসমূহ

হাফিযুল মুলক রহমত খান শেষ দিকে রোহিলাখণ্ড অধিকার করেন। তাঁর নবাবীর যমানায় তিনি রোহিলাখণ্ডের মশহুর শহরগুলোকে দিল্লীর ঈর্ষার বস্তু হিসেবে গড়ে তোলেন। অনেক অনুরোধ করে তিনি মওলানা বাহ্‌রুল উলূমকে শাহ্‌জাহানপুর নিয়ে আসেন। তাঁর জন্যে একটা বিশেষ মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। মওলানা দীর্ঘ ২০ বছর এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষাদান করেন।[২৬]

জ্ঞানের বিস্তারে হাফিযুল মুলক এর অবদান এবং এজন্য স্বল্প সময়ে তিনি যা করেছেন, গুলে রহমত (گل رحمت) গ্রন্থের রচয়িতার বর্ণনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

باشماع خبر قدر شناسی و دین پروری حافظ الملك صدها علماء امتبحر مثل مولنا عبد العلی لکهنوی وغیرهم در تمامی شهر هائے کیٹهر مجتمع شده مواجب کثیره زیاده از حاجت از سرکار می یافتند و در مساجد و مدارس که برائے ایشاں از سرکار ترتیبے یافته بود بفراغ خاطر درس و تدریس اشتغال می ورزیدند، و در هر مدرسه کتب درسی و وظیفه طلبه از سرکار تعین حی یافت –

হাফিযুল মুলক জ্ঞানী-গুণীদের অত্যন্ত সমাদর করেন এবং দীনের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অত্যন্ত আন্তরিক এ সংবাদ পেয়ে মওলানা আব্দুল আলী লক্ষ্ণৌবীর মত শ্রেষ্ঠ 'আলিম কিথড়[২৭] বা রোহিলাখণ্ডের নানা শহরে সমবেত হন। এঁরা সরকারের কাছ

থেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে এঁদের জন্যে মসজিদ মাদ্‌রাসা নির্ধারিত ছিল। এসব 'আলিম সেখানে মনোনিবেশ সহকারে দরস ও তাদরীসে আত্মনিয়োগ করেন। প্রতিটি মাদ্‌রাসায় ছাত্রদের জন্যে পাঠ্য পুস্তক এবং বৃত্তি নির্ধারিত ছিল সরকারের পক্ষ থেকে।[২৮]

টীকা ঃ গুলে রহমত হাফিযুল মুলক এবং তাঁর খান্দানের বিস্তারিত ইতিহাস। হাফিযুল মুলক এর পৌত্র মুহাম্মদ সা'আদাত ইয়ার এ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের শুরুতে তিনি লিখেন ঃ

در سال یکهزار و دو صد و جهل و نه هجری بنده خاکسار محمد سعادت یار ابن حافظ محمد یار خان نبذے از حالات و واقعات جد بزرگ خود اعنی حافظ الملك رحمت خان بهادر مرحوم که بکمال عدالت گستری و نیك نامی حکومت ملك کیٹهر فرموده اند، بقید تحریر آو رد و در ضمن آں احوال بعضے پادشاهاں وامیراں آن عهد نیزمی نگارد تایادگار ماند وایں تالیف نو مسمی به گل رحمت منتخب است از کتاب گلستانِ رحمت که پیش از ین جناب عمومی صاحب محمد مستجاب خان مرحوم بکمال تحقیق و توضیح تسوید فرمودند۔

'এই অধম মুহাম্মদ সা'আদাত ইয়ার ইবনে হাফিয মুহাম্মদ ইয়ারখান ১২৪৯ সালে আমার পিতামহ মরহুম হাফিযুল মুলক রহমত খান বাহাদুরের কিছু জীবনিতিহাস ও ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। আমার দাদা-মরহুম সুখ্যাতি ও নেক নামের সাথে সাথে পরিপূর্ণ ইনসাফ সহকারে কিথড় বা রোহিলাখণ্ড শাসন করে যান। আনুষঙ্গিক ভাবে সে সময়ের কোন কোন বাদশাহ এবং আমীর সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে, যাতে এ গ্রন্থ স্মৃতি হয়ে থাকতে পারে। এ নুতন গ্রন্থের নাম 'গুলে রহমত'। 'গুলিস্তানে রহমত' গ্রন্থ থেকে এটা গৃহীত হয়েছে। ইতিপূর্বে মুহাম্মদ মুস্তাজাব খান অতি শ্রম স্বীকার করে সবিস্তারে এ গ্রন্থটি রচনা করেন।'

সে কালের একজন হিন্দু লেখক কুন্দন লাল আশকী ফার্সী ভাষায় রচিত তার কিতাব 'নুযহাতুন নাযির' (نزهة الناظر) মানে 'দর্শকের আনন্দ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে উল্লেখ করেন ঃ

یاد دارم که در ایام تحصیل فقیر در بلدة بریلی قریب رصد کس طالب علم آشائے فقیر بود ند –

'আমার মনে আছে যে, এ অধম ছাত্র জীবনে বেরিলী শহরে প্রায় তিন'শ ছাত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিল।'[২৯]

পেলিভেত মাদ্‌রাসা

হাফিয রহমত খান শাহজাহানপুর এবং বেরিলীর মত এখানেও একটা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামে মসজিদ নিমার্ণ করলে সে উপলক্ষে মাদ্‌রাসার ইমারতও নির্মাণ করেন। এখানেও ছাত্রদের জন্যে বৃত্তি নির্ধারিত ছিল। ছাত্ররা শিক্ষা সমাপ্ত করলে মরহুম নবাব সাহেব নিজহাতে ছাত্রদের মাথায় ফযীলতের পাগড়ি বেঁধে দিতেন। এবং সাথে সাথে তাদের জন্যে শাহী কোষাগার থেকে ভাতা নির্ধারিত করে দিতেন।

অযোধ্যার মাদ্‌রাসাসমূহ

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অযোধ্যা ছিল কিছুটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এখানে পাঁচ-দশ ক্রোশ অন্তর অন্তর কুলীন অভিজাতদের বসতি ছিল। সেরা সেরা 'আলিম ফাযিলগণ এসব স্থানে দরস দিতেন। দুর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে এসব দরসে শরীক হতো। বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে এসব মাদ্‌রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্যে গ্রামসমূহ নিষ্কর করে দেয়া হত। মা'আসিরুল কিরাম (مـاثـر الكرام) গ্রন্থে মওলবী গোলাম আলী আযাদ লিখেন ঃ

اگر چه جمیع صوبجات هند بوجود حاملان علم تفاخر دارند، اما صوبه اوده واله آباد خصوصیتے دارد که در هیچ صوبه فتواں یافت، چه در تمام صوبه او ده واکثر صوبه اله آباد بفاصله پنج کروه نهایت دو کروه آبادی شرفا رنجباء ست که از بسلاطین و حکام و ظائف و زمین و مدد معاش داشته اند – و مساجد و مدارس و خانقاهات بنانهاده و مدرسان عصر در هرجا ابواب علم بر روئے دانش پردهان کشاده و طلبائے علم خیل خیل می روند، وهرجا موافقت دست بهم داد به تحصیل علوم مشغول می شدند، وصاحب قوفیقات هر معموره طلبئه علم رانگاه می داد نه ، و خدمت ایں جماعت را سعادت عظمی میدانند –

'জ্ঞানের ধারক বাহকদের অস্তিত্বের জন্যে যদিও হিন্দুস্তানের সকল প্রদেশ গর্ব করতে পারে; কিন্তু অযোধ্যা ও এলাহাবাদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য

প্রদেশের নেই। কারণ অযোধ্যা প্রদেশের সর্বত্র এবং এলাহাবাদের অধিকাংশ স্থানে পাঁচ-দশ ক্রোশ পরই অভিজাত শ্রেণীর নিবাস আছে। এঁরা সুলতানদের তরফ থেকে মাসিক বৃত্তি, কৃষি জমি এবং আর্থিক সুবিধা লাভ করেন। মসজিদ মাদ্রাসা এবং খানকা নির্মাণ করে সে কালের সেরা শিক্ষকগণকে নিযুক্ত করেন।

এঁরা সর্বত্র জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করে তুলে ধরেন। দলে দলে তাঁদের কাছে ছাত্ররা গমন করে জ্ঞান লাভের জন্যে। এঁরা অভিনিবেশ সহকারে জ্ঞান লাভে মনোনিবেশ করেন। প্রত্যেক এলাকার বিত্তবানরা এসব ছাত্রদের পতি লক্ষ্য রাখেন্। তাঁরা ছাত্রদের খিদমতকে নিজেদের জন্যে বড় সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতেন।'[৩০]

সুহালী

সুহালীও সেসব মশহুর কসবার অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ্ণৌ থেকে এর দূরত্ব ২২ মাইল। শায়খ নিযামুদ্দীন আনসারী নামে একজন মশহুর 'আলিম এ কসবায় এসে বসবাস করেন। তিনিই সেখানে দরস তাদরীসের সিলসিলা শুরু করেন। তাঁর প্রপৌত্র শায়খ হাফিয বাদশাহ আকবরের শাসনকালে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। তৈমুরীদের শাসনামলে গোটা হিন্দুস্তানে ওয়াকায়ে নিগার তথা ঘটমান ইতিহাস লিপিবদ্ধকারীদের সিলসিলা জারি ছিল। এদের মাধ্যমে বাদশাহ আকবরের কাছে তাঁর খবর পৌছালে বাদশাহ তাঁর জন্যে জায়গীর নির্ধারণ করেন। এর ফলে শায়খ আরো স্বাচ্ছন্দের সাথে দরস তাদরীসে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। ছাত্রদের সম্পূর্ণ ব্যয় ভারও শায়খ-ই বহন করতেন। এসবই করতেন তিনি তাঁকে প্রদত্ত শাহী বৃত্তি থেকে।

মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদ ছিলেন শায়খ হাফিজের বংশের চতুর্থ অধস্তন পুরুষ। তাঁর পিতা লাহোরের কোন এক মাদ্রাসায় শিক্ষক ছিলেন। তিনি অধিকাংশ কিতাব পিতার কাছেই পড়েন। অন্য শিক্ষকদের কাছেও কিছু কিছু কিতাব পড়েন। ছাত্র জীবন শেষে সুহালীতেই তিনি দরস দিতে শুরু করেন। চতুর্দিকে তাঁর শোহরত ছড়িয়ে পড়লে বাদশাহ আলমগীর তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু নির্জন বৃত্তের বাইরে যাওয়া তাঁর পসন্দ ছিল না। হিজরী ১১০৩ সালে মোল্লা সাহেব শহীদ হন। সেদিন থেকে সুহালীর জ্ঞানের আসর ফিরিঙ্গী মহলে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

লক্ষ্ণৌ

সর্ব প্রথম শায়খ আযম জৌনপুর থেকে শিক্ষা লাভ করে লক্ষ্ণৌ আগমণ করেন। তাঁর শাহ পীর মুহাম্মদ দীর্ঘ দিন ধরে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে শিক্ষার আসর সরগরম

রাখেন। তাঁর পরে তার সুযোগ্য ছাত্র মোল্লা গোলাম নকশবন্দ (র) জ্ঞানের এ আসরে রওনক ততোধিক বর্ষিত করেন। শাহপীর মুহাম্মদ (র) যে স্থানে তালীম দিতেন, সে স্থান সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। খুব সম্ভব বর্তমানে শাহ পীর মুহাম্মদের টিলা নামে যে স্থানটি খ্যাত, শিক্ষার আসরের কারণে তার এ নাম করণ হয়েছে।

মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদ সুহালীর স্বনাম ধন্য সন্তান মোল্লা নিযামুদ্দীনের ফয়েয ফিরিঙ্গী মহলকে হিন্দুস্তানের ইল্‌ম আমলের কেন্দ্রে পরিণত করে। মহান পিতার শাহাদাতকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। তখন তিনি শরহে মোল্লা জামী পড়েন মাত্র। অবশিষ্ট কিতাবাদি পাঠ করেন মোল্লা আলী কুলী জায়েসী' মওলানা নকশবন্দ গোরক্ষ পুরী, মওলানা আব্দুস সালাম দেওভী এবং মওলানা আমানুল্লাহ বেনারসীর নিকট।

২৪ বছর বয়সে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে শিক্ষকের আসনে বসেন। সুহালীর জ্ঞানের মশাল রওশন হয় ফিরিঙ্গী মহলে। বাদশাহ আলমগীর আওরঙ্গজেব ফিরিঙ্গী মহলের বাড়ীটি বসবাসের জন্যে দান করেন। ফরমানের কয়েকটি বাক্য প্রণিধান যোগ্য ঃ

فرمان واجب الاذعان صادر شد که یك منزل حویلی فرنگی محل بامتعلقه آن واقع بلده لکهنو مضاف بصوبه اوده که از امکنه نترولی است برائے بودن شیخ محمد سعد و محمد سعید پسران ملا قطب الدین شهید حسب الضمن مقدر فرمودم -

এ মর্মে জরুরী ফরমান জারী করা হচ্ছে যে, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহর সন্নিহিত ফিরিঙ্গী মহলের একটা এলাকা মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদের সন্তান দ্বয় শায়খ মুহাম্মদ সা'আদ ও শায়খ মুহাম্মদ সাঈদের বসবাসের জন্যে এতদসঙ্গে নির্ধারণ করে দেয়া হল।'

মোল্লা নিযামুদ্দীন তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাই এ ফরমানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। প্রায় দীর্ঘ আড়াই শ' বছর পর্যন্ত তাঁদের খান্দানে অবিরাম 'আলিম-ফাযিল সৃষ্টি হয়ে আসছে। কেবল হিন্দুস্তানের নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানে এটা এক বিরল ঘটনা।এঁদের প্রত্যেকেই জ্ঞান সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। এঁদের দরসগাহ থেকে হাজার হাজার আলিম বের হয়ে দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্! এ ফয়েজ এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে দেওয়া, জায়িস, গোপামাও, খায়রাবাদ ইত্যাদি এলাকার নামও উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত স্থানে মওলানা আব্দুস সালাম, দ্বিতীয় স্থানে 'মোল্লা 'আলী কুলী, তৃতীয় স্থানে কাযী মুবারক এবং চতুর্থ স্থানে মওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী প্রমুখ 'আলিম দীর্ঘদিন দরস ও তাদরীসে মশগুল ছিলেন। এঁদের ইলমের ফয়েয ছিল ব্যাপক এবং দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। মোল্লা নিযামুদ্দীন প্রথমোক্ত বুযুর্গদ্বয়ের হালকায়ে দরসে শরীক হয়ে তাঁদের ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

এসব কসবার মধ্যে বেলগ্রাম-এরও বিশেষ স্থান রয়েছে। শিক্ষার দিক থেকে এ স্থানটি সুদীর্ঘকাল ধরে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিল। বেলগ্রামের মাটি থেকে অনেক মশহুর আলিম-ফাযিল জন্ম নিয়েছেন, স্ব স্ব অঞ্চলের উলামাদের গুণে এসব এলাকা কার্যত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ফতেহগড় মাদ্‌রাসার নামও উল্লেখযোগ্য। নবাব সা'আদাত আলী খানের উযীর হাকীম মাহদী এবং নবাব গাযীউদ্দীন লক্ষ্ণৌ থেকে এসে কিছুকাল ফতেহগড় অবস্থানকালে এ মাদ্‌রাসাটি গড়ে তোলেন। মাদ্‌রাসাটির বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। মিসেস পেনী পার্কস তাঁর রোজ নামচায় এ মাদ্‌রাসাটির কথা উল্লেখ করেছেন।[৩১] শায়খ মুহিব্বুল্লাহ, কাযী মুহাম্মদ আছিফ, শায়খ মুহাম্মদ আফযাল, শাহ খূব উল্লাহ, শায়খ মুহাম্মদ তাহির, হাজী মুহাম্মদ ফাখের যায়ের, মওলভী বরকতুল্লাহ, মওলভী জারুল্লাহ এবং অন্যান্য কৃতী আলিম এলাহাবাদে দীর্ঘ দিন দরস ও তাদরীসের সিলসিলা জারি রাখেন।

এসব বুযুর্গের নেক চেষ্টার ফলে প্রায় এক শতাব্দী ধরে সেখানে জ্ঞানের আসর জমজমাট ছিল। শাহ আফযাল-এর দায়রা অদ্যাবধি বর্তমান রয়েছে এবং কোন প্রকারে ঐতিহ্যবাহী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জ্ঞান-পিপাসুরা দীর্ঘ দিন ধরে এখানে তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করে আসছেন।

ফররুখাবাদের মাদ্‌রাসাসমূহ

বাহাদুর শাহের শাসনকালে ফররুখাবাদের একটা মাদ্‌রাসা সম্পর্কে জানা যায়। এ মাদ্‌রাসার নাম ছিল ফখরুল মারাবে' (فخر المرابع)। কেউ কেউ এ মাদ্‌রাসাকেই রব' উল মাফাখির (ربع المفاخر) উল্লেখ করে কনৌজের একটা মাদ্‌রাসা বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু আমার মতে এটা নামের বিভ্রাট। রব' উল মাফাখের বা ফখরুল মারাবে' নামে কনৌজের কোন মাদ্‌রাসা সম্পর্কে আমি ইতিহাস গ্রন্থে কোন সন্ধান পাইনি।ফখরুল মারাবে' ফররুখাবাদেরই মাদ্‌রাসা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মওলবী ওলী উল্লাহ নামক জনৈক বুযুর্গ। মওলবী 'আলীমুদ্দীন এবং মওলবী নঈমুদ্দীন এ মাদ্‌রাসায়ই শিক্ষা লাভ করেছিলেন।[৩২]

নবাব আসিফুদ্দৌলার উযীর হাসান রেযা খান ফররুখাবাদে (খুব সম্ভব ফয়েযাবাদই বিশুদ্ধ) একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[৩৩] মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ খান খায়রাবাদী ছিলেন এ মাদ্‌রাসার অন্যতম শিক্ষক। এটা বাদশাহ শাহ আলমের শাসনকালের কথা। আসারে খায়র (آثار خـيـر) গ্রন্থ রচয়িতার বর্ণনামতে ফররুখাবাদের শাসনকর্তা নবাব মুহাম্মদ খান বঙ্গেশও এখানে একটা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। ছাউনী মহল্লার যে স্থানে এ মাদ্‌রাসাটি ছিল, তা এখনও মাদ্‌রাসা মহল্লা নামে পরিচিত। দুঃখের বিষয়, মাদ্‌রাসাটির প্রতিষ্ঠাকাল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

জৌনপুরের মাদ্‌রাসাসমূহ

মুসলিম শাসনামলে জৌনপুর শিক্ষার জন্য এতটা খ্যাত ছিল যে, তাকে শীরাযে হিন্দ (شـيـراز هند) বা হিন্দুস্তানের শীরায নগরী বলে অভিহিত করা হতো। বাদশাহ শাহজাহান গর্ব করে বলতেন (پورب شـيـراز ماست) আমাদের প্রাচ্য শীরায। বিশেষ করে জৌনপুরকে তিনি 'শীরাযে হিন্দ'-এর খিতাব দিয়েছিলেন। শের শাহের মত ভারতবর্ষের মশহুর বাদশাহ জ্ঞানের এ পুণ্যভূমিতেই প্রতিপালিত হন। সিকান্দরনামা, গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ ইত্যাদি গ্রন্থ শেরশাহের কণ্ঠস্থ ছিলো। দর্শন সম্পর্কে তাঁর পড়াশুনা ছিলো। তাঁর 'আরবী পড়াশুনা সম্পর্কে 'কাফিয়া' (كـافـيـه) 'শরহে কাফিয়া' (شـرح كـافـيـه) এবং 'তাযকেরায়ে শায়খ শিহাবুদ্দীন'-এর নাম জানা যায়। তিনি প্রাচীন রাজা বাদশাহদের ইতিহাসের ভক্ত পাঠক ছিলেন। অধিকন্তু 'আলিম উলামা এবং শায়খগণের সঙ্গে মাদ্‌রাসা এবং খানকাসমূহে যেতেন। 'আলিম উলামাগণের জন্যে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য মুকর্রর করেছিলেন। বিবি রাজা বেগম হিজরী ৮৪৫ অথবা ৫৬ সালে জৌনপুরে একটা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।৩৪ তাঁর নামেই মাদ্‌রাসাটির নামকরণ করা হয়। হিজরী ৯০২ বা ৯০৪ সালে সুলতান সিকান্দর লোদী জৌনপুর অধিকার করলে হোসাইন শাহ শার্কী-এর পরাজয়ের ফলে শার্কী বংশের সুলতানদের শাসনের অবসান ঘটে। সুলতান লোধী বিজয়লাভ করেই মসজিদ এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান বাদে সমস্ত ইমারত ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। ৩৫ সেদিন থেকেই শার্কীদের শাসন প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়। কিন্তু জৌনপূরের জ্ঞানের আসর তার সাক্ষ্য একটুও বিঘ্নিত হয়নি। প্রশাসনিক দিক থেকে জৌনপূরকে দিল্লীর অধীনে আনার পর বাদশাহ শাহজাহান গর্ব করে বলেন ঃ এ আমাদের প্রাচ্য শীরায– (پورب شيراز ماست)

বাদশাহ শাহজাহান জৌনপুরের 'আলিম এবং ছাত্রদেরকে নিয়মিত বৃত্তি দেয়ার জন্য জৌনপুরের শাসনকর্তাদেরকে সাধারণ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। 'ওয়াকেয়ানিগারের' প্রতি সমস্ত মাদ্‌রাসার অবস্থা সম্পর্কে লিখে জানাবার নির্দেশ ছিল। কোন নতুন মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়েছে এবং তা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য–এ খবর পেলেই সম্রাট শাহজাহান তৎক্ষণাৎ বৃত্তি মঞ্জুর করতেন। আমীর উমার শাহাজাদাগণ এবং শাসকরা জৌনপূর দিয়ে অতিক্রমকালে এসব মাদ্‌রাসা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আবশ্যিকভাবে সে সব মাদ্‌রাসার অবস্থান করতেন। দিল্লীর বাদশাহ্‌দের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে এ সব মাদ্‌রাসার জন্যে ব্যক্তিগত তহবিল থেকেও তাঁরা সাধ্যানুপাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ দান করতেন।

আনুমানিক হিজরী ১১৪৭ সালে নবাব সা'আদাত খান নিশাপূরী আযোধ্যা, জৌনপূর এবং বেনারসের সুবাদার নিযুক্ত হলে প্রথা মাফিক তিনিও এ মহান শহর পরিদর্শনে যান। কিন্তু সেখানকার 'আলিম উলামাগণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না আসায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যান। তিনি তাঁদের জায়গীরসমূহ (ভূ-সম্পত্তি) বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ কার্যকর করার ফলে জৌনপূরের সকল শিক্ষামূলক তৎপরতা অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্র শিক্ষক এবং 'আলিমগণ সেখান থেকে চলে যান। গোটা জনপদ এবং মাদ্‌রাসাসমূহ বিরান হয়ে পড়ে। হিজরী ১১৮৭ সালে নবাব আসফদ্দৌলা 'আলিমগণের জায়গীর ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইলিচ খান এই নির্দেশের বিরোধিতা করেন। এ সময় জৌনপুর ইংরেজদের অধিকারে আসে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ডংকিন শহরটি দেখে ধ্বংসের জন্য আক্ষেপ করেন। তদানীন্তন কমিশনার এবং বেনারসের কালেক্টরের সরকারী কাগজ পত্রে এর গৌরবময় অতীত ইতিহাসের অক্ষয় কীর্তি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে লেখা রয়েছে ঃ

জৌনপুর ছিলো মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল, 'আলিমগণের মিলন কেন্দ্র। এ জৌনপুর 'শীরাযে-হিন্দ' এর খিতাব লাভ করেছিলো। এককালে সেখানে ছিলো অনেক মাদ্‌রাসা। বর্তমানে কেবল তার অতীত গৌরবের কাহিনী অবশিষ্ট রয়েছে। আমরা বলতে পারি যে, এ শহরটি ছিলো হিন্দুস্তানের শীরায বা মধ্য যুগের প্যারিস। জৌনপুরের প্রত্যেক শাহযাদা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকরূপে গর্ব করতেন। জ্ঞানীগুণীগণ এ শাহী রাজধানী নগরীর শান্তিপূর্ণ ভূমিতে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। মুহাম্মদ শাহ-এর সময় পর্যন্ত জৌনপুরে ২০টি মশহুর মাদ্‌রাসা বর্তমান ছিল। এখন শুধু এগুলোর নামই অবশিষ্ট আছে। এসব মাদ্‌রাসার মধ্যে একটার প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ইন্তিকাল করেন আর অপরটার প্রতিষ্ঠাতা ইন্তিকাল করেন সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে।'[৩৬]

ইটালার মসজিদ

জৌনপুরে এ মশহুর মসজিদটি আসলে মালিকুল উলামা (আলিমদের সম্রাট) শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদীর মাদ্‌রাসা। এ কৃতিসন্তানের বদৌলতে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে জ্ঞানের আসর সরগরম ছিল। এর আশপাশে বিরাট এলাকা জুড়ে, যেসব হুজরা রয়েছে এগুলা ছাত্র-শিক্ষকদের আবাসিক কক্ষ ছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।

বেনারস

এখানে মওলানা আমানুল্লাহ্ বেনারসীর মশহুর শিক্ষাগার ছিলো। মোল্লা নিযামুদ্দীনও এখানে শিক্ষালাভ করেছেন। তবে এটা পূর্ণাঙ্গ মাদ্‌রাসা ছিল কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যায় না। এটি পূর্ণাঙ্গ মাদ্‌রাসা হয়ে থাকলে তার বিস্তারিত ইতিহাস আমরা অজ্ঞাত।

আযমগড়

নতুন এ ছোট জেলাটি প্রাচীন কালে জৌনপুরের সাথে যুক্ত ছিল। এ কারণে এখানকার অধিকাংশ সন্তান জৌনপুরের বলে পরিচিত ছিলেন। মোল্লা মাহমূদ, জৌনপূরী নামে মশহুর ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনিও ছিলেন এ আযমগড়ের বাসিন্দা। চিরিয়া কোট, মুহাম্মদাবাদ, ওলীদপুর, নিযামাবাদ, মাহেল, সরায়ে মীর, মুবারকপুর, ময়ো ইত্যাদি আযমগড়ের মশহুর কসবা।

ওলীদপুর

মোল্লা মাহমূদের জন্মস্থান। মওলবী হাসান আলী ছিলেন মাহেল-এর মাদ্‌রাসার মুদাররিস ও মুফতি। চিরিয়াকোটের মাটি থেকে এ শেষ যুগেও মওলানা এনায়েত রসূল এবং মওলানা ফারুকের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম হয়েছে, যাঁরা ছিলেন গর্বের ধন। এখানে অতীতের শিক্ষার বহুল প্রসারের ছাপ এখনো সুস্পষ্ট।

গাযীপুর

এ প্রসঙ্গে গাযীপুরের নামও উল্লেখযোগ্য। এ পুণ্য-ভূমি থেকেও অনেক 'আলিম ফাযিলের উদ্ভব। মওলানা ফসীহী এবং মওলানা 'আবদুল্লাহ্ গাযীপুরী ছিলেন এ অঞ্চলের গর্বের ধন। বিগত কালে অনেকেই পূর্বদেশ থেকে এখানে এসে শিক্ষা লাভ করেছেন। বর্তমানেও এখানে একটা প্রাচীন মাদ্‌রাসা ফার্সী শিক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে খ্যাত।

বিহারের মাদ্‌রাসাসমূহ

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী সর্বপ্রথম বিহার এবং বাংলায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন। বিস্তারিত বিবরণ জানা না গেলেও তাবাকাত-ই নাসিরী এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপে এতটুকু জানা যায়

যে, বখতিয়ার খিলজী বিজিত এলাকার কোন কোন শহরে একাধিক মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন কুতুবুদ্দীন আইবেকের বিশ্বস্ত আমীর। তাঁর বিজয় অভিযানের ফলে বাংলা বিহারে ইসলামী শরীআতের প্রচার-প্রসার হয়েছে। ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তা লিখেন ঃ

اولین کسے از شاهان اسلام که بآں نواح رفته و شعار اسلام را
در آں حدود رواج داده محمد بختیار خلجی است –

'মুসলিম বাদশাহদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম এসব অঞ্চলে ইসলামী আদর্শের প্রচলন করেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী।'[৩৭]

বিহারে শিক্ষার বর্তমান অগ্রগতি তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের স্পষ্ট প্রমাণ। দীর্ঘ দিন থেকে সেখানে শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হচ্ছে। সব যুগে সেখানে সৃষ্টি হয়েছেন বড় বড় 'আলিম। আজ থেকে প্রায় চার শ' বছর পূর্বে সুলতান সলীম শাহ-এর শাসনামলে মাহদবীয়্যা ফিকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ 'আলায়ী এবং সেকালের অন্যান্য 'আলিমদের মধ্যে মাহদী সম্পর্কে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলে তাতে সালিস বা বিচারক নিযুক্ত করা হয় বিহারের একজন 'আলিম শায়খ তাইয়্যেবা বুধনকে। এ ছাড়াও মোল্লা মহিব্বুল্লাহ এবং গোলাম ইয়াহইয়া ছিলেন তাঁদের সমসাময়িক কালের সবচেয়ে মশহুর ওস্তাদ। সাধারণ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাঁদের দরসের পরিধি ছিলো অত্যন্ত বিস্তৃত, দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁদের কাছে আসতো এবং বিদ্যাভ্যাস করতো। এঁরা যেখানে দরস দিতেন তা স্বয়ং সম্পূর্ণ কোন মাদ্‌রাসা ছিল, নাকি বিশেষ কোন ইমারতে তাঁরা দরস দিতেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অবশ্য, এটা সবাই স্বীকার করেন যে, জ্ঞানের প্রচারে–প্রসারে এসব বুযুর্গদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে তাদের রচিত পুস্তকাদির পাল্লা যে কত ভারী তা' সর্বজনবিদিত।

বিহারের 'আলিমদের অনেকেই মুঘল বাদশাহদের পক্ষ থেকে বড় বড় পদে নিয়োজিত ছিলেন। বাদশাহ নামা (بادشاه نامه) গ্রন্থের লেখক মোল্লা আবদুল হামীদ লাহোরী সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলের 'উলামাদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

سید احمد سعید موطنش از توابع صوبه مهار است، علوم عربیت
خصوصا علم فقه که در ان نیك مستحصر است نزد والد خود ملا
سعد که از فضلاعر آں دیار بود اند و خته بدرگاه کیواں جاه آمده

بقلا فرروزی اختر مسعود داخل بندگاں سعادت ائین گر حید وهس

از چندے بخدمت افتائے اردوئے گیهاں پونے نوازش یافت –

সুবে বিহারের অধিবাসী সৈয়দ আহমদ সাঈদ 'আরবী জ্ঞান বিশেষ করে, ইল্‌মে ফিক্‌হে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উক্ত শহরের অন্যতম প্রধান জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর পিতা মোল্লা সা'দের নিকট তিনি জ্ঞান হাসিল করেন। কিওয়ানজাহ-এর দরগায় উপস্থিত হয়ে তিনিও ভাগ্যবান ব্যক্তিদের পর্যায়ভুক্ত হন। কিছুকাল পর তিনি ইফ্‌তা-এর খিদমতে নিয়োজিত হয়ে প্রচুর খ্যাতি ও প্রাচুর্য লাভ করেছেন।[৩৮]

ফরীদপুরের বাসিন্দা মওলবী সিরাজুদ্দীন আহমদ সম্রাট শাহ আলমের উস্তাদ ছিলেন তায্‌কিরায়ে 'সুবাহে গুলশান (تزكـرة صـبـح گلشن) গ্রন্থের রচয়িতা মওলবী আমান আলী মমতাজ-এর আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন ঃ

نبیره مولوی سراج احمد متوطن فرید پور که بفاصله شانزده

کروه از عظیم آباد است و این مولوی سراج الدین احمد شاه عالم

عالی گوهر باد شاه دهلی را استاد بود –

"আযীমাবাদ থেকে ষোল ক্রোশ দূরবর্তী ফরিদপুরের বাসিন্দা মওলবী সিরাজুদ্দীন আহমদ-এর পৌত্র সেখানে বসবাস করেন। আর এই মওলবী সিরাজুদ্দীন আহমদ হচ্ছেন দিল্লীর মহামান্য বাদশাহ শাহ আলমের উস্তাদ। বিহারে সচারাচর অধিকাংশ আমীর রইস ব্যক্তি ইলমের অবিনশ্বর সম্পদেও ভূষিত হতেন। তাঁরা সাংসারিক অভাব অনটনমুক্ত থেকে নিজ নিজ বাস ভবনে বসে বসে তালীম তদরীসের মাধ্যমে জ্ঞানের সর্বোত্তম খিদমতে নিয়োজিত থাকতেন। আর যেসব আমীর ওমরা জ্ঞানের ধারক বাহক ছিলেন না তাঁরাও সমকালীন মান রক্ষার খাতিরে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদেরকে নিজেদের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখতেন। শিক্ষার্থীদের জন্যে বৃত্তি এবং জায়গীর মুকর্রর করতেন আর এ সব নেককাজকে তাঁরা পারলৌকিক মুক্তির উপায় বলে মনে করতেন। বিহারে আজও এ পবিত্র প্রথার স্মৃতি বর্তমান রয়েছে।

ইলম চর্চার জন্য খ্যাত বিহারের কসবা ও গ্রামসমূহ

প্রাচীন কাল থেকেই বিহারের কতিপয় কসবা ও গ্রাম ইল্‌ম চর্চার কেন্দ্র হিসাবে চলে আসছে। সেখানে এই শেষ যুগেও মশহুর অনেক আলিম জন্ম নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অতি মশহুর কয়েকটি গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

মানের ঃ এখানে মুতাকাদ্দিমীন এর মধ্যে শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া এবং মুতাআখখেরীন-এর মধ্যে মওলবী গোলাম মুজীব, মওলবী ইযহারুদ্দীন ও মওলবী

লুৎফ আলী (র) অতি নামকরা 'আলিম ছিলেন। [প্রথমোক্ত বুযুর্গ সেকালের সুবে বাংলার রাজধানী সোনার গাঁয়ে অবস্থান করে দীর্ঘদিন এতদঞ্চলে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছেন। ইনি বহু মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করে যান। তাঁর মক্তূবাত বা পত্রাবলী "মক্তূবাতে সদী (পত্রশতক) (مکتوبات صدی) নামে খ্যাত–অনুবাদক]।

সাহ্সারাস ঃ এখানে মওলবী সলীমুল্লাহ ও শাহ্ কবীরুদ্দীন মশহুর ব্যক্তি ছিলেন।

রুহাই ঃ এখানে মওলবী মুফতী গোলাম কাদির মশহুর ছিলেন। [মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতার বিখ্যাত 'হেড মওলানা' মওলানা ইয়াহ্য়া সাহ্সারাসী এই সাহ্সারাসেরই বাসিন্দা ছিলেন] –আবদুল্লাহ বিন সাঈদ]

ডিয়ানুয়া ঃ এখানে মাওলানা শামসুল হক মুহাদ্দিস মাওলবী হাফেজ নূর আহমদ এবং মওলবী মুহাম্মদ যুবায়র মশহুর 'আলিম ছিলেন। প্রথমোক্ত জন এমন বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁর জন্য হিন্দুস্তান এখনও গর্ব করতে পারে। তিনি আজীবন 'ইলম-ই-হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্যে তাঁর কাছে সুদূর মদীনা, ইয়েমেন এবং নজদ থেকে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসতো। হাদীস এ সুনানে আবূ দাউদের উৎকৃষ্ট শরাহ তিনি লিখেন। এ শরাহ পাঠ করে 'আরব-আযমের জবান থেকে উচ্ছ্বসিত প্রসংশা বাক্য নির্গত হয় স্বতঃস্ফুর্তভাবে। আত্-তা'লীকুল মুগনী আলাদ্দারা কুতনী (التعليق المغنى على الدار قطنى) ও মরহুমের উৎকৃষ্ট রচনা। শেষোক্ত 'আলিম অতি অল্প বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। 'ইলমে মাকূলাত তথা দর্শন, কালাম ও তর্ক বিদ্যা এবং জ্যামিতিতে ইনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

মহিউদ্দীনপুর ঃ মওলানা (তালাত্তুফ) হুসাইনের জন্মস্থান। ইনি ছিলেন হিন্দুস্তানের মশহুর আলিম এবং আহল-ই-হাদীসের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় সদস্য।

নগর নহশা ঃ প্রাচীন কাল থেকে 'আলিম-ফাযিলদের লালন ভূমি। মাওলানা আমানুল্লাহ, মওলানা সলীমুল্লাহ, মাওলানা আলিমুল্লাহ, মাওলানা মাদীনুল্লাহ, মাওলানা ইব্রাহীম, মাওলানা তাসাদ্দুক হুসাইন, মাওলানা খাল্লাক, মাওলানা গুলজার আলী এবং মাওলানা আলীমুদ্দীন এখানকার মাটিতেই জন্ম নিয়েছেন। মাওলানা আলীমুল্লাহ মুখতাসারাতে মাওলানা জামালুদ্দীন বিহারীর, মুতাওয়ালাতে মাওলানা কায়েম এলাহাবাদীর আর হাদীস তাফসীরে মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (র)-এর শাগরিদ ছিলেন।[৩৯] তিনি মীর যাহিদের হাশিয়া লিখেন। মুসাল্লামুছ সুবুত-এর শরাহ প্রণয়ণরত অবস্থায় তাঁর ইতিকাল হয়। তিনি ফার্সী ভাষায় মহানবী (সা)-এর শত মুজেযাসমূহের বর্ণনা সম্বলিত কাব্যে একটা জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন এবং এর নাম

দেন কাসীদা-ই-উয্মা' (قصیده عظمی) তার এ ফার্সী কাব্য পাঠ করে

بخد رات سرا پردهائے قرآنی – چه دلربر اند که دل فی برند پنهانی،

ইরানবাসীদেরকেও বিস্মিত হতে হয়।
কুরআনের পর্দাগুলো আদ্যাপান্ত রহস্যাবৃত।
তা কতই না চিত্তহারী!
চিত্তকে নিয়ে যায় কত গভীরে।

মওলানা ইব্‌রাহীম মরহুম ফার্সী ভাষায় মুহিব্বী শরহে দিওয়ানে মুতানাব্বী শিরোনামে দিওয়ানে মুতানাব্বীর একটা ব্যাখ্যাপুস্তক রচনা করেন। মওলানা তাসাদ্দুক হুসাইন খাল্লাক ফার্সী ভাষায় অগাধপাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর একটা গযলের তিনটি পংক্তি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

ائے زلف یار بامنت ایں هیچ و تاب چیست دل را سپرده ام
بتودیگر عتاب چیست

آهسته روکه سیربه بیئم جمال دوست –
اے عمرئیزگام ترا ایں شتاب چیست
مویت سفید گشته و خلاق غافلی
صبح از افق و میده دگروفت خواب چیست

হে মোর বন্ধু যলফী! আমার সঙ্গে কিসের এ লুকোচুরি! হৃদয় মন সপেছি তোমায়, তবে কিসের এ গ্লানি?

ধীরে চলো, যাতে সখার রূপ দর্শন করতে পারি। হে দ্রুতগামী জীবন, কিসের জন্যে এত তাড়াহুড়া? চুলতো গিয়েছে তোমার সফেদ হয়ে। অথচ খাল্লাক তুই গাফিল। পূর্ব দিগন্তে ফুটে উঠছে ভোরের আলো তবে এ নিদ্রা আবার কিসের?

মওলানা আলীমুদ্দীন মরহুম ছিলেন হরফন মৌলা। তাঁর রচিত সুল্লামুল আফলাক' (سلم الافلاك) তাঁর স্মৃতি অম্লান করে রেখেছে।

নিমি ঃ মওলানা যহীর আহসান শাওক এর জন্ম ভূমি। 'আরবী ফার্সী ও উর্দুতে গদ্য ও পদ্য রচনায় ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ছোট খাট গ্রন্থ বাদ দিয়ে হাদীসে আসারুস সুনান (آثار السنن) তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ। এ বিশাল গ্রন্থের এক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হলে হাদীস শাস্ত্রের বিরাট খিদমত হত। উর্দু ভাষায়

কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর উর্দু এবং কাব্য সঙ্কলন 'সূয ও গুদায' (سوز و گداز) এবং একখানা 'মছনবী' প্রকাশিত হয়েছে।

কাহাটটা ঃ সাহারানপুর ও কোলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক মওলবী সা'আদাত হুসাইন মরহুমের জন্মস্থান।

গীলানী ঃ মওলানা আহসান সাহেব মানতিকীর জন্মভূমি।

আস্থানাওয়া ঃ মওলানা হাফিজ ওহীদুল হক মরহুমের জন্মস্থান। বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাড়াও বিহারের ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এ মাদ্‌রাসাটি আজও উক্ত এলাকার জন্য ইল্‌মের ঝর্ণাধারা হিসাবে কাজ করছে। মওলবী মুহাম্মদ আহসানও ছিলেন এ খানকার অন্যতম প্রধান আলিম। তিনি অধিকাংশ সময় বিহারের খানকামহলে দরস ও তাদরীসে মশগুল ছিলেন।

দেসনাহ ঃ মাদ্‌রাসা-ই-খানকাহ, সাহসারাসের মুদার্‌রিসে 'আলা মওলানা মুস্তফা শের এবং বিহারের এক মাদ্‌রাসার শিক্ষক অংক বিদ্যা বিশারদ মওলানা মুহাম্মদ ইয়া কুবের জন্মস্থান। [আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ) ও এই দেসনারই কৃতী সন্তান ছিলেন। সম্পাদক]

রহীমাবাদ ঃ মরহুম মওলানা আবদুল আযীযের জন্মস্থান। এঁরা সকলেই ছিলেন সুবে বিহারের অধিবাসী। এঁদের কর্ম কাণ্ড ছিল বিহার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিহারে এমন অনেক আলিম-ফাযিলেরও জন্ম হয়েছে, যাঁরা প্রথমে জ্ঞান লাভের জন্যে দিল্লী এবং অযোধ্যায় গমন করেছেন, কিন্তু শিক্ষা জীবন শেষে সেখানে শিক্ষকের আসনে বসেন। অযোধ্যায় মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ এবং দিল্লীতে মওলানা নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিসে দেহলভী ছিলেন এঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শেষোক্ত বুযুর্গ ছিলেন বিহারের সূর্যগড় নামে একটা ছোট গ্রামের বাসিন্দা। কিন্তু দিল্লীতে বসে ইল্‌মে হাদীসের যে খিদমত তিনি করেছেন তা সকলেরই জানা। ভারতবর্ষের এমন কোন এলাকা নেই যেখানে তার শিষ্য-শাগরেদ নেই।

সাহ্‌সারাম ঃ এখানে হযরত শাহ কবীরের খানকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটা আযীমুশশান মাদ্‌রাসা। মাদ্‌রাসায় রয়েছে একটা বিশাল গ্রন্থাগার, যাতে রয়েছে আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা মূল্যের কিতাব। মাদ্‌রাসা এবং খানকার জন্যে ফররুখ সিয়র এবং সম্রাট শাহ আলমের শাসনকাল থেকে বিরাট ভূ-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ রয়েছে। এ মাদ্‌রাসা ও খানকা এখনো বিরাট ফয়েয বরকতের কেন্দ্র।

দানাপূরের মাদ্‌রাসা ঃ নবাব আসফ খান দানাপুরে মসজিদ মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর সময়ে ইমারতের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়নি। নবাব হায়বত জঙ্গ তাঁর শাসনামলে এগুলোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। মওলবী আব্দুল হক

দেহলভী তাঁর 'গারাবাত নিগার' (غرابت نگار) গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ

ان عمارتوں کی خوش وضعی کو وہاں کی کوئی دوسری عمارت نہیں پہنچ سکتی -

সেখানকার অন্য কোন ইমারত এই ইমারতের সুন্দর নির্মাণ কৌশলের কাছেও পৌঁছাতে পারেনা।

ফুলওয়ারী খানকার মাদ্‌রাসা ঃ বিহার প্রদেশে পাটনা থেকে ৬-৭ মাইল দূরবর্তী ফুলওয়ারী খানকা আযোধ্যার ফিরিঙ্গী মহলের মতই খ্যাত। এখানকার খানকা ও সাজ্জাদা (গদী) যাহিরী ও বাতিনী ইলমের কেন্দ্র। এখানকার সাজ্জাদানশীনরা দরসও দিতেন। মশহুর 'আলিম ফাযিলগণ এ পথ দিয়ে গমনকালে খানকায় অবস্থান করতেন। মওলানা বাহ্‌রুল উলুম বাংলাদেশের বুহার গমনকালে এখানে অবস্থান করেন। মওলানা ইসমাঈল শহীদ এবং মওলানা আব্দুল হাইও এখানে আগমণ করেছেন। বিহারের 'আলিমরা হিন্দুস্তানের অধিকাংশ বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডে শরীক ছিলেন। ফতওয়া-ই-আলমগীরী সংকলনের কাজেও বিহারের দু'জন 'আলিম শরীক ছিলেন। তাঁদের একজন এই ফুলওয়ারীর অধিবাসী, অপর জন মুঙ্গেরের। ফুলওয়ারী খানকায় সর্বদাই উলামা ও মুদাররিসীন ছিলেন। বর্তমানেও আছেন। এখানে ছাত্রদের জায়গীর পেতে অসুবিধা হয় না। তা'লিম তা'দরীসের সিলসিলা এখানে সব সময় জারী ছিল, বর্তমানেও রয়েছে।

পাটনা মাদ্‌রাসা ঃ আযীমাবাদ শহরে মাদ্‌রাসা মসজিদ নামে একটা মহল্লা আছে। মসজিদের ইমারত এখনো বর্তমান রয়েছে। এর ধরন থেকে বুঝা যায় যে, ইমারত দীর্ঘ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে স্থানটি অত্যন্ত মনোরম। মসজিদ অত্যন্ত প্রশস্ত। আশ-পাশের ইমারতগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত। স্থানে স্থানে প্রাচীরের কিছু কিছু চিহ্ন থাকলেও তার পরিমাণ ততটুকু নয় যদ্দারা মূল ইমারত সম্পর্কে ধারনা করা যেতে পারে। আশপাশের লোকেরা মসজিদের ভূমিকে নিজেদের ভূমির সাথে মিলিয়ে নিচ্ছে। এ ধারা চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই অবশিষ্ট চিহ্নও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কোন গ্রন্থ বা কোন শিলালিপি থেকে আমি স্পষ্ট কিছু জানতে পারিনি, কিন্তু আযীমাবাদের প্রবীণ বৃদ্ধদের অনেকের মুখে শুনতে পেয়েছি, সাইফ খান নামে কোন এক আমীর এসব ইমারতের প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য এই নামে সুবে বিহার ও বাংলার একজন সুবেদার ছিলেন। তার রাজধানী ছিল পুর্ণিয়ায়। সম্ভবতঃ তিনিই পাটনায় এসব ইমারত নির্মাণ করে থাকবেন। সাইফ খান নামে আরো একজন বিদ্যোৎসাহী সুবেদার ছিলেন। কিন্তু তিনি সুবেদার ছিলেন মাত্র দু'বছরের জন্যে। এত স্বল্প সময়ে তিনি এ ইমারাতগুলো নির্মাণ করেছেন, এমন ধারণা করা যায় না। কারণ,

এত সব ইমারত নির্মাণে অন্তত ৬-৭ বছর প্রয়োজন। পাটনা শহরের সাদেকপুর মহল্লায় একটা মশহুর খানদান আছে। এ খান্দানটি জ্ঞানের চর্চার জন্যে বিখ্যাত। এ খান্দানে এমন অনেক বড় বড় 'আলিম ছিলেন, যাঁদের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই জানে। তাই এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এখানকার প্রত্যেক 'আলিম সবসময় দরস ও তাদরীসের সিলসিলা জারি রেখেছেন। এ খান্দানটি ছিল অবস্থাপন্ন। তাই তারা নিজেরাই অনেক ছাত্রের খরচ বহন করতেন। পাটনায় শামসুল ওলামা মৌলবী সাইদ নামে একজন মশহুর ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি নিজে ছিলেন একজন "আলিম ফাযিল ব্যক্তি। জ্ঞানের রাজ্যে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হবে। শেষ যুগে মওলানা হাকীম আবদুল হামীদ, মওলবী আব্দুল বারী, মৌলবী কামাল আলীপুরী এবং মওলানা আব্দুল হাকীম সাদেকপুরী তাঁদের সময়ের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। বর্তমানেও এ শহরে অনেক 'আরবী মাদ্‌রাসা রয়েছে।

বাংলার মাদ্‌রাসাসমূহ

বিহারের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী সর্ব প্রথম এ এলাকা জয় করেন। তাঁর বিজয়সীমা বাংলার প্রাচীন শহর নদীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি প্রাচীন শহর নদীয়ার পরিবর্তে রংপুর শহর আবাদ করেন। সেখানে অনেক মসজিদ-মাদ্‌রাসা এবং খানকা স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতা লিখেন ঃ

و در سرحد بنگاله در عوض شهر نودیا شهرے موسوم به رنگ پور بنا کرد دار الملك خود ساخت و مساجد و خانقاه و مدارس را شهر و لایت برسم اسلام برونق و رواج تمام مزین و محلی گردانید –

বাংলার সীমান্তে তিনি নদীয়া শহরের পরিবর্তে রংপুর নামে একটা শহর নির্মাণ করে ঐ শহরকে নিজের রাজধানী রূপে গ্রহণ করেন। ইসলামী রীতি অনুযায়ী তিনি সেখানে অনেক মসজিদ মাদ্‌রাসা এবং খানকা স্থাপন করে সেগুলোকে সুসজ্জিত ও সুশোভিত করেন।[৪১]

বাংলার সুবাদার গিয়াসুদ্দীন সিংহাসনে বসেই লক্ষ্ণৌতী তথা লক্ষ্মণাবতীতে একটা মসজিদ, একটা মাদ্‌রাসা এবং একটা সরাইখানা স্থাপন করেন।[৪২] 'উমরপুর গ্রামে একটা স্থান আছে। যার নাম এখনো দরস বাড়া [৪৩] বা মাদ্‌রাসা বলে খ্যাত। এর ধ্বংসাবশেষের দেয়ালে একটা শিলালিপি রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তা ইউসুফ শাহী আমলের তৈরী। এ শিলালিপিতে একটা মসজিদেরও উল্লেখ রয়েছে, যার কোন চিহ্নই এখন আর অবশিষ্ট নেই। 'আসরিয়াত-ই-হিন্দ' (اثریات هند) বা

'হিন্দুস্থানের প্রাচীন নিদর্শন' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি মাদ্‌রাসার ইমারতের সাথে যুক্তছিল।

ইস্থিপুরে আর একটা মাদ্‌রাসা ছিল, এখনো যার ধ্বংসাবশেষের নাম মাদ্‌রাসাটিলা।[৪৪] গৌড়ে সাগর-দীঘির উত্তর পাড়ে একটা চতুস্কোন ইমারতের চিহ্ন এখনো বর্তমান রয়েছে। এসম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এটা মাদ্‌রাসা ছিল। সম্ভবতঃ হুসাইন শাহ ছিলেন এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা, বর্তমানে ইমারতের যেটুকু চিহ্ন পাওয়া যায়, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাদ্‌রাসাটি ছিল অতি খুব সুরত আযীমুশশান এবং অতি প্রশস্ত। স্থানে স্থানে মর্মর পাথরে এবং লোহিত পাথরের চিহ্ন পাওয়া যায়।

এ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, গৌড়ের অন্যান্য ইমারতের তুলনায় এটি ছিল অনেক জাঁকজমকের।

'খুরশীদ জাঁহাঁনামা'র লেখক এলাহী বকশ হুসাইনীর বর্ণনা অনুযায়ী গৌড়ের গোড়া বা শহীদ বা গোর শহীদ মহল্লায় রিয়াজুস সালাতীনের রচয়িতা গোলাম হুসাইনের বাড়ীর নিকটে একটা মাদ্‌রাসা সম্পর্কে জানা যায়। এ মাদ্‌রাসার ধ্বংসাবশেষের উপর যে শিলালিপি পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় যে, এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুসাইন শাহ।[৪৫] শিলালিপির মূল পাঠের অনুবাদ এই ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ সুদূর চীন দেশে (গিয়ে) হলেও তোমরা জ্ঞানের অন্বেষণ কর।' মহান সুলতান সাইয়্যেদুস সা'দাত 'আলাউদ দুনিয়া ওয়াদ্দীন, আবুল মুযাফফর হুসাইন শাহ, আল মালিকুল হুসাইন (আল্লাহ তার রাজত্ব স্থায়ীকরুন) এর নির্দেশে হিজরী ৯০৭ সালের পয়লা রমযান তারিখে এ মাদ্‌রাসাটি নির্মাণ করা হয়।

গৌড়ের এ দুটি মাদ্‌রাসা সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ 'মুসলমানদের শাসনামলে হিন্দুস্তানে জ্ঞানের উন্নতি' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। টীকায় রবিনশ ৩৪ ও ৮০ এর বরাত দেয়া হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ এখানে দু'টি মাদ্‌রাসা ছিল না, ছিল একটি। খুরশীদ জাঁহানামার লেখক এর ভিন্ন ঠিকানা দেয়ায় দু'টি মাদ্‌রাসা বলে হয়তো ভ্রম হয়েছে। অথবা প্রথম মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা হুসাইন শাহকে মনে করা ঠিক নয়। অন্য কেউ তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ অবস্থায় দু'টি মাদ্‌রাসা হতে পারে।

ঢাকা

'আমীরুল 'উমারা শায়েস্তা খান ছিলেন বাদশাহ আলমগীরের মামা। বাদশাহ শাহজাহান এবং বাদশাহ আলমগীরের শাসনকালে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আমীর। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নাযিম ছিলেন তিনি। তিনি যেখানেই গিয়েছেন, স্মৃতি রেখে এসেছেন। মা'আসিবুল উমারার রচয়িতা লিখেন ঃ

اثار خیر از قبیل رباط و مسجد و جسر (که لکها بصرف آں

رفتہ) در چار دانگ هندوستان ازوے بسیار یادگار - صفحه ۷۰۵ جلد دوم

—মসজিদ, মাদ্‌রাসা, সরাইখানা, সেতু ইত্যাদি অনেক কল্যাণকর কাজের স্মৃতি রেখে গেছেন তিনি।[৪৬]

তিনি ঢাকায় নদীর তীরে একটা মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। বিগত শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মাদ্‌রাসাটি টিকে ছিল। কিছুকাল বিরান থাকার পর বর্তমানে মাদ্‌রাসার ইমারতকে ইডেন হাসপাতালের (ঢাকায় নদীর তীরে ইডেন নয়, বরং মিটফোড হাসপাতাল হতে পারে। লেখক তথ্য সংগ্রহে ভুল করেছেন-- অনুবাদক) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে নদীর তীরে কেবল একটা ঘাট এবং মসজিদ অবশিষ্ট রয়েছে। মসজিদের দেয়ালে কিছু লেখা ছিলো, অগ্নিকাণ্ডের ফলে তা নষ্ট হয়ে গেছে। যেটুকু পড়া যায় তা এই ঃ

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين اما بعد انكه جوں اين مقام خجسته فرجام خير خواه فقراء اميدوار رحمت حق جل و علا شائسته خان امير الامراء احداث نموده وقف شرعی کرده که تمام محصول اين بصرف تعميرو وظيفه خدمت مسجد و مستحقين و متوكلين .... حكام ذوى الاقتدار و امراء نامدار اين امر خير مستمر و مستقر دارند كه دريں وقف ,,,,,, نمايد .... حق محروم خواهد شد .... كرده .... مستحقين .... شد سال ......

উপরের লিপি থেকে এটা জানা যায় যে, আমীরুল উমারা নবাব শায়েস্তা খান মসজিদটি নির্মাণ করে শরিআতের বিধানানুযায়ী ওয়াকফ করেছেন।

(শিফাউল মুলক) হাকীম মৌলবী হাবীবুর রহমান লিখেন যে, ঢাকা শহর তলীর মশহুর বুযুর্গ শাহনূরী 'কিবরীতে আহমার' (كبريت احمر) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বাল্যকালে প্রায় চার মাইল দূরবর্তী মগবাজার থেকে পায়ে হেঁটে এ মাদ্‌রাসায় পড়তে আসতেন। এটা আনুমানিক হিজরী ১১২০ সালের ঘটনা। হাকীম সাহেব বলেন, আমার কাছে-- ফতওয়া খানিয়ার একটা কপি আছে। ১১৪৩ হিজরীতে কোন ছাত্র এ মাদ্‌রাসায় বসে এটা লিপিবদ্ধ করেছিল। শায়েস্তা খাঁর অসমাপ্ত কেল্লা থেকে আনুমানিক দু'ফার্লং দূরে একটা বড় মসজিদ আছে। খান মুহাম্মদ মির্ধার মসজিদ নামে এটি পরিচিত। মসজিদটির ইমারত দোতলা। নীচে ছিল ছাত্রদের

হোস্টেল। মসজিদের উত্তর দিকে আঙ্গিনার চার দিকে খোলা হাওয়াদার প্রশান্ত কামরাগুলো আজো মাদ্‌রাসা নামে বিদ্যমান এবং মশহুর রয়েছে। মসজিদে নিম্নোক্ত লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে ঃ

بعهد شاه اهل همت و داد.
که داد انقیاد شرع و دین داد
زهے شاهے که باشد زیب او رنگ
خهے ماهے که مهرش گشته منقاد
دل صدق اشنائے حامی شرع
عباد الله قاضی کرد ارشاد
که از بهر عبادت خان محمد
کند مسجد بصدق خویش بنیاد
بفکر سال تاریخش چو رفتم
نوائے هاتفی از غیب در داد
سر کفر از بنائش رفت برباد
زطاعتش خانه اش تاریخ ایجاد
سنه ١١١٦ هجری

--সাহসী ও বিচারক বাদশাহর শাসনামলে,
যিনি ছিলেন শরীআতের অনুসারী, দীনের পাবন্দ।
ধন্য বাদশাহ, ধন্য সিংহাসন,
কারণ, চন্দ্র হয়েছে বাধ্য তাঁর।
সত্য ছিল, শরীআতের অনুসারীর শাশ্বত বন্ধু,
কাযী 'ইবাদুল্লাহ্ বলেছেন একথা।
'ইবাদতের তরে খান মুহাম্মদ
স্থাপন করেছেন ভিত এ মসজিদের।
এর সন-তারিখ নিয়ে যখন চিন্তা করি,
তখন গায়েব থেকে আসে অদৃশ্য আওয়ায।
এর ভিত্তিস্থাপনের ফলে কুফরীর মাথা হয়েছে বরবাদ,
'তাআত খানা' থেকেই হয়েছে তার তারিখ।
১১১৬ হিজরী।

আওরঙ্গজেব আলমগীরের জ্যৈষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ আযমের নামে ঢাকায় একটা মহল্লা আছে। আযমপুরা (আজিমপুর) মহল্লার ময়দানে একটা দ্বিতল মসজিদ আছে। এ

মসজিদের দোতলায় উত্তর দিকের প্রশস্ত কক্ষগুলো এখনো মাদরাসা বলে পরিচিত। উৎকীর্ণ লিপি থেকে মনে হয় এটি ছিল তাসাউফ ও ইলম-ই-বাতিনের চর্চা কেন্দ্র। অবশ্য পরে ইলম-ই-যাহির ইলম-ই-বাতিনের স্থান গ্রহণ করে। তখন থেকে এটা মাদরাসা বলে খ্যাত হয়। উৎকীর্ণ লিপির ছন্দোবদ্ধ পাঠ এরূপ ঃ

عارف حق شناس فیض الله

ساخته مسجدے لوجه الله

باد بهر حصول عین یقین

عابداں را وسیله اوثق

مسکن ذاکران صاحب شوق

مثل قصر بهشت پر رونق

پئے تاریخ آں عبادت گاه

در دلم مریخت، معنی الیق

انه مامن کبیت الله

معبد جامع لاهل الحق

سنه ١١٦٠ هجری

সত্যানুসারী আরিফ ফয়যুল্লাহ।
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছেন মসজিদটি।
ক্রটি হোক আইনুল ইয়াকীন হাসিলের জন্যে,
ইবাদতকারীদের জন্যে মযবুত উসিলা।
আগ্রহী যিকরকারীদের জন্যে হোক নিবাসস্থল,
বেহেশতের রওনকপূর্ণ প্রাসাদের মত।
সে ইবাদত গাহর তারিখের তরে
সৃষ্টি হয়েছে অন্তরে মোর যথোপযোক্ত বাক্যঃ
বায়তুল্লাহর ন্যায় এটি নিরাপদ স্থান
সত্যানুসারীদের জন্যে জামে মসজিদ।
১১৬০ হিজরী।

মুর্শিদাবাদ

নবাব আলীবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদী ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনুরাগী। সিয়ারুল মুতাআখখিরিন থেকে জানা যায় যে, তিনি আযীমাবাদ থেকে অনেক আলিম-ফাযিলকে মুর্শিদাবাদ আসার আমন্ত্রণ জানান। তাদের জন্যে তিনি বহুমূল্য বৃত্তি ভাতা, মঞ্জুর

করেন। তাঁর দাওয়াতে যেসব আলীম আযীমাবাদ থেকে মুর্শিদাবাদ গমন করেন, তাদের কয়েক জনের নাম এই মীর মুহাম্মদ আলী, হুসাইন খান, আলী ইবরাহীম খান, হাজী মুহাম্মদ খান প্রমুখ। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত জন ছিলেন এক বিরাট গ্রন্থাগারের মালিক। তাঁর গ্রন্থাগারে কিতাবের সংখ্যা ছিল দু' হাজার। মুর্শিদাবাদে কাটরা মাদ্‌রাসা নামে একটা মশহুর মাদ্‌রাসা আছে। এ মাদ্‌রাসার শানদার ইমারত এখনো অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জাফর খান ছিলেন এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা।[৪৭]

নরেন্দ্রনাথ লা'র গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের শিলাপুর নামক একটা স্থানে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত কতিপয় শিক্ষা কেন্দ্র বর্তমান ছিল। এসব শিক্ষা কেন্দ্রকে ভারতবর্ষের অতীত যুগের স্মৃতিবাহী মনে করতে হয়। এ সব মাদ্‌রাসায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা 'আরবী, ফারসী শিক্ষা লাভ করত। বর্তমানে বাংলার মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বের অধিকারী না হলেও তাদের অতীত ছিল নিঃসন্দেহে গৌরবময়। সরকার এবং সরকারের আমীর ওমরারা এসব মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছেন, যেখানকার সাধারণ জমিদারাও জ্ঞানের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্টুয়ার্ট তাঁর 'হিস্টরী অফদ্যা বেঙ্গল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বীর ভূমির একজন বড় জমিদার আসাদুল্লাহ জ্ঞানের চর্চা এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্যে তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি ওয়াকফ করে যান।

বুহার

বর্ধমানের বুহার গ্রামের বড় জমিদার মুন্সি সদররুদ্দীনের আবেদনক্রমে মওলানা বাহরুল 'উলুম সেখানে গমন করেন। মুন্সী সদরুদ্দীন খান বুহারে মাওলানা মরহুমের জন্য একটা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। মাওলানা দীর্ঘদিন এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[৪৮] যতদূর মনে হয় হিজরী ১১৭৮ সালের পর মাদ্‌রাসাটি স্থাপিত হয়। এর সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না। সেকালে মাওলানা মরহুমের বেতন ছিল (৪০০) চারশ টাকা। তাঁর বেতন এবং ছাত্রদের বৃত্তিও মুন্সি সদরুদ্দীন মুকর্রর করে দেন। এখানে মওলানার মশহুর শাগরিদদের একজন ছিলেন সাইয়্যেদ গোলাম মোস্তফা বর্ধমানী। ইনি কিছু কাল অটোয়া জেলার মুফতি ছিলেন। এরপর বীরভূম জেলার মুফতি নিযুক্ত হন। ফার্সীতে কবিতা রচনায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন।[৪৯] তাঁর ফার্সী কবিতার দুটি চরণ এখানে পেশ করা হচ্ছে ঃ

وی كه قهال تامتش جلوه گر از نظر گذشت

دل زشكيب باز ماند جان زترار درگذشت

عشق چه آفت آورد هر گز از ان خبر نبود

هیچ مپرس سرگن شت برق بلا زسر گذشت

তার দৈর্ঘের আকৃতি নয়নকে করেছে বিমোহিত।
চিত্তে থাকেনা কোন চিন্তা, মনে স্থান পায় শান্তি সুস্থিতি।
ইশক কি আপদ নিয়ে এসেছে তাঁর কোন খবরই নেই।
কেউ জিজ্ঞাসা করেনা বিপদের বিদ্যুৎ ছুটার ইতিহাসের কথা।

দাক্ষিণাত্যের মাদ্‌রাসা

হিন্দুস্তানের যে প্রান্তেই মুসলমানদের কদম পড়েছে, যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার, ইতিহাস সাক্ষী যে, তার প্রতিটি ধুলিকণা জ্ঞানের আলোক প্রভায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। এ যাবৎ আমি উত্তর ভারতের মক্তব-মাদ্‌রাসা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মুসলমানরা ভারতবর্ষে জ্ঞান বিস্তারের জন্যে কত বড় চেষ্টা-সাধনা করেছেন, উপরের আলোচনা থেকে পাঠকের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন আমি দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে আলোচনা করব। সেখানে জ্ঞানের প্রসার সম্পর্কে ইতিহাসে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, এখানে তা উপস্থাপন করব ঃ

বেদর মাদ্‌রাসা

কেবল দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন নিদর্শনে নয়, বরং গোটা উপমহাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এই মাদ্‌রাসাটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মুহাম্মদ শাহ বাহমনির মশহুর বিদ্যানুরাগী উযীর খাজা জাহান মাহমুদ গাওয়ান। মাদ্‌রাসাটির ইমারত এখনো বর্তমান রয়েছে আর বিশ্ব-পর্যটকদের জন্যে এতে রয়েছে, শিক্ষনীয় বিষয়। মাদ্‌রাসাটির কোন কোন অংশ ধ্বংস প্রায়। কিন্তু দর্শক এক নজরেই এর অতীত গৌরব, শান-শওকত এবং এর প্রশস্ততা ও মযবুতী সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। ফরাজ পাহাড়ের উপর এ মাদ্‌রাসাটি স্থাপিত হয়। মাদ্‌রাসাটির দৈর্ঘ্য পূর্ব পশ্চিমে (৭৫) পঁচাত্তর গজ। এবং প্রস্থ উত্তর দক্ষিণে ৫৫ (পঞ্চান্ন) গজ। মাদ্‌রাসার সামনে দু'টি সুউচ্চ মিনার ছিল। এর একটি এখনো বর্তমান রয়েছে, মিনারের উচ্চতা ১০০ ফুট, মাদ্‌রাসার আঙ্গিনায় ছিল মসজিদ। আঙ্গিনার চারদিকে ছিল ছাত্র এবং শিক্ষকদের হোষ্টেল। যে সব ছাত্র শিক্ষক মাদ্‌রাসায় থাকতেন ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যয় নির্বাহ করা হত। মাদ্‌রাসার জন্যে দূর থেকে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। মোট কথা, গোটা উপমহাদেশে মাদ্‌রাসার জন্যে এর চেয়ে বিশাল ইমারত কোন যুগেই নির্মিত হয়নি।

মাহমূদ গাওয়ানের ইন্তিকালের পর তার বিদ্যানুরাগ সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা পাওয়া যায় মীর তকী হাস্সান রচিত হাদীকাতুল আকালীম' (حديقة الاقاليم) এর বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তেকালের পর তাঁর বাস ভবনে বিভিন্ন বিষয়ক ৩৫ হাজার গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। সামীয়ী নামক সে কালের একজন কবি রাব্বানা তাকাব্বাল 'মিন্না এই আয়াত থেকে মাদ্‌রাসাটির প্রতিষ্ঠা সাল বের করেন এবং একটি রুবাইয়াত বা চতুর্দপদীতে এভাবে তা বর্ণনা করেন ঃ

این مدرسه رفیع محمود بنا

چود کعبه شده است قبله اهل منا

اثار قبول بین که شد تاریخس

از آیس ربنا تقبل منا

এ মহান মাদ্‌রাসা, ভিত যার প্রশংসনীয়, কা'বার ন্যায় হয়েছে কিবলা এর নির্মল অন্তঃকরণের অধিকারীদের জন্যে স্পষ্ট কবুলিয়তের চিহ্ন দেখুন এর তারিখ হয়েছে,

'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না' আয়াত থেকে।

গুলবার্গা

আহমদ শাহ্ বাহমনী তাঁর পীর সাইয়্যেদ মাহমুদ গেসুদরায-এর জন্য গুল বার্গা অঞ্চলের কোন এক স্থানে একটা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। বর্তমানে স্থানটি সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যায় না। নরেন্দ্রনাথ লা' তাঁর গ্রন্থে এ মাদ্‌রাসা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এর প্রতিষ্ঠা কাল ১৪২২ খৃষ্টাব্দ। আহ্মদ শাহ্ বাহমনী ছিলেন উক্ত পীর সাহেবের মুরীদ। তাই পীরের জন্য এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা সত্য হতে পারে। অবশ্য মাদ্‌রাসাটি ছিল খানকার মাদ্‌রাসার ধারার।

গোলকুণ্ডা

''আসার-ই-খায়ের' (آثار خير)-এর রচয়িতা শামসুল 'উলামা মওলবী যাকাউল্ল 'তারীখে হিন্দ' এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, গোলকুন্ডার শাসনকর্তা ইবরাহীম কুতূব শাহ তাঁর রাজধানীতে বেশ কয়েকটা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছিলেন।

চাহার মিনার [হায়দরাবাদ]

গোলকুন্ডার মুহাম্মদ কুলী কুতুব শাহ হায়দরাবাদে অনেকগুলো মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস 'তারীখে আযীয দাক্ষাণ থেকে জানা যায় যে, চাহার মিনার স্থাপিত হয় হিজরী ৯৯৮ সালে। এ চাহার মিনারে একটা বড় মাদ্‌রাসা ছিল। পর্যটক মিউবীনাট তাঁর সফর নামায় এ সম্পর্কে আলোচনা করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করেছেন। কুতুব শাহ ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক এবং শিক্ষাবিস্তারের বিরাট সহায়ক। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তিনি নিজ রাজ্যে অনেকগুলো মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছিলেন। একজন ইউরোপীয় লেখক শায়রিল তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেন ঃ

তিনি দক্ষিণ ভারতে অনেকগুলো প্রাথমিক মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছেন। এসব মাদ্‌রাসায় ছাত্ররা বেঞ্চে বসতো এবং বাঁশের কলম দিয়ে চীনা কাগজের উপর লিখতো। এ সব কাগজ অতি স্বচ্ছ, কিন্তু ইউরোপীয় কাগজ থেকে নিম্ন মানের।

য়াতীমদের জন্য মাদ্‌রাসা

বাহমনী খান্দানের মশহুর শাসনকর্তা মাহমূদ শাহ তাঁর রাজ্যে য়াতীমদের জন্য অনেক মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রসিদ্ধ শিক্ষকদেরকে নিয়োজিত করেন। সকল ব্যয়ভার বহন করা হতো শাহী ভান্ডার থেকে। ইনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং 'আলিমভক্ত বাদশাহ তিনি নিজেও অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং দর্শন ও বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ জন্য প্রজারা তাকে 'এ্যারিষ্টটল' খিতাব দিয়েছিল। ছোট খাট স্থানগুলো বাদ দিয়ে বড় বড় যে সব স্থানে মাদ্‌রাসা ছিল, সেগুলো হচ্ছে গুলবার্গা, বেদর, কান্দাহার ইলাচপুর, দৌলতাবাদ, চাওল, ওয়াহেল ও খুবাইর। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক ফিরিশতা লিখেন ঃ

وجهت محدثان اخبار حضرت نبوى صلعم در شهر هائے كلاد وظائف مقررو كرده در تفظيم ايشا ميكوشيد، و نابينايان را مشاهره داده تعقد حال ايشان مى كرد -

—আঁ হযরতের বাণী চর্চাকারী মুহাদ্দিসদের জন্য তিনি বড় বড় শহরে বৃত্তি নির্ধারিত করেন এবং তাঁদের সম্মান করার চেষ্টা করেন। অন্ধদের জন্য বৃত্তি মনযুর করেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।

বিজাপুর

দক্ষিণাত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মদ আদিল শাহ-এর যামানায় আছার শরীফ এবং বিজাপুর জামে মসজিদে দু'টি করে মাদ্‌রাসা ছিল। এগুলোতে 'আরবী ফার্সী শিক্ষা দেয়া হতো। এছাড়া কয়েকটি মকতবে 'কুরআন শরীফ পড়ানো হতো। এখানে গরীব ছাত্রদেরকে খাবার এবং মাসিক খরচের জন্য প্রত্যেককে এক ' হোন' (স্থানীয় মুদ্রা বিশেষ) দেয়া হতো। বৎসর শেষে জিলহজ্জ মাসে পরীক্ষা হতো। পরীক্ষার পর ইনাম দেয়া হতো। শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী চাকুরী দেয়া হতো। এ ছাড়াও দেশের বড় বড় মসজিদে মাদ্‌রাসা ছিল। এসব মাদ্‌রাসায় ছাত্রদের ব্যয়ভার নির্বাহ করতো সরকার।[৫০]

লেখক এখানে মসজিদেরও উল্লেখ করেছেন। শাহ্ হুসাইন নিযাম শাহ-এর শাসনামলে কাযী বেগ তেহ্‌রানীর উদ্যোগে ইমরারতে বাগদাদের নিকটে এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। তিনি টীকায় ঐতিহাসিক ফিরিশতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আহমদনগর কেল্লায় ইমারতে বাগদাদের কথা তারীখে ফেরেশতায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে মাদ্‌রাসাও ছিল, এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে আমি জানতে পারিনি।

আহমদ নগর

বুরহান নিযাম শাহ্ শী'আ মত গ্রহণ করেন এবং এ মত প্রচলনের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করেন। ইসনা আশা'রী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাও ছিল এসব পন্থার অন্যতম। আহমদ নগর দুর্গের বিপরীত দিকে এ মাদ্‌রাসার জন্য ইমারত নির্মাণ করা হয়। এর নিকট বার ইমামের নামে একটা লঙ্গরখানা স্থাপন করা হয়। মাদ্‌রাসা এবং লঙ্গর খানার খরচের জন্য জৌনপুর, সঁওর, আসিয়াপুর ইত্যাদি অনেকগুলো গ্রাম ওয়াকফ ছিল। 'আছার-ই-খায়ের এর লেখক উল্লেখ করেন যে, নিযাম শাহ্ আহমদ নগরে বাগদাদী মাদ্‌রাসা নামে অপর একটা মাদ্‌রাসাও স্থাপন করেন।

বুরহানপুর

তাপসী নদীর তীরে একটা মাদ্‌রাসা ছিল। কোন এক খান্দিস সুলতান এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য প্রতিষ্ঠাতার নাম নিশ্চিত করে জানা যায় না। অরিয়েন্টাল এ্যানুভেল এর লেখক ১৮২০ সালে এ মাদ্‌রাসার নিদর্শন দেখেছেন এবং শানদার ভাষায় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

দৌলতাবাদ

এ মাদ্‌রাসাটিও খান্দেশ-এর কোন এক বিদ্যোৎসাহী সুলতানের কীর্তি। দুঃখের বিষয় এর বিদ্যানুরাগী প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই আমি জানতে পাইনি। শায়খ যিয়াউদ্দীন এবং শায়খ বুরহানুদ্দীন এ মাদ্‌রাসার শিক্ষক ছিলেন।

মাদ্রাজের মাদ্‌রাসা

মাদ্রাজের নবাব ওয়ালাযাহ্ মাওলানা বাহ্‌রুল উলুমের সুখ্যাতির কথা শুনে তাঁকে সেখানে খবর দিয়ে নিয়ে আসেন। মাওলানা মাদ্রাজের নিকট পৌছলে নবাব সাহেব মাওলানার অভ্যর্থনার জন্য সভাসদ পরিষদবর্গ এবং উযীরগণ ও আমীর ওমরাদেরকে প্রেরণ করেন। মাওলানা দরবারে পৌঁছলে নবাব সাহেব তাঁর আসন থেকে উঠে গিয়ে মাওলানাকে সেখানে বসান। নবাব ওয়ালাযাহ্ শাহী মহলের নিকট একটা বড় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে মাওলানাকে সদরুল মুদাররিসীন নিযুক্ত করেন। মাওলানা এ

মাদ্‌রাসায় দীর্ঘ দিন শিক্ষাদান করেন। উত্তর ভারত মাওলানাকে বাহরুল উলুম উপাধিতেই জানে। কিন্তু দক্ষিণ ভারত মাওলানাকে জানে নবাব ওয়ালাযাহ্-এর দেয়া উপাধি মালিকুল উলামা বা আলিমদের বাদশাহ্ নামে।

সালোয়ার মাদ্‌রাসা

নবম শতকের শুরুতে দিলওয়ার খান নামে একজন আমীর মালোয়ার একটা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শাদী আবাদ মন্ডুকে তিনি রাজধানী করেন। মালওয়ার সুলতানদের জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে শহরটি জ্ঞানপীঠে পরিণত হয়। এখানে অনেক বড় বড় আলিমদের জন্ম হয়েছে। কুল্লিয়্যাতে খাকানীর বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার মুহাম্মদ দাঊদ আলী শাদী আবাদী এ ভুমিতেই জন্ম গ্রহণ করেন। হিজরী ৮৩৮ সালে অপর এক শাসনকর্তা সুলতান হুশাং এর ইন্তিকাল হয়। ঐতিহাসিক কাসেম ফিরিশতা এ প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

نعش سلطان هو شنك را بر داشتة متوجه مدرسه شادی اباد
منڈو شدند .... واں جابخاك سپردند –

সুলতান হুশাং-এর লাশ শাদীআবাদ মন্ডু মাদ্‌রাসায় নিয়ে যাওয়া হয়, পরে সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হুশাং-এর পর মুহাম্মদ শাহ্ প্রায় এক বছর কাল শাসন কার্য পরিচালনার পর ইন্তিকাল করেন। এর পর সুলতান মাহমুদ খিলজী সিংহাসনে বসেন। একজন সুশাসক ছাড়াও ইনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভক্ত, বিদ্যোৎসাহী, উলামা-ফুযালাদের পৃষ্ঠপোষক এবং শিক্ষার্থীদের আশ্রয়স্থল। হিজরী ৮৩৯ সালে সিংহাসনে আরোহণ করে দেশে অনেক মক্তব-মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। দূর-দূরান্ত থেকে আলিম-ফাযিলদেরকে খুঁজে আনেন এবং তাদের সব রকম পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এর ফলে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত চর্চা হয় যে, মালওয়া দ্বিতীয় গ্রীস বলে অভিহিত হয়। 'মাআসিরে রাহীমীর লেখক লিখেছেন ঃ

چوں سلطنت باو قرار گرفت در تربیت علماء و فضالاء کوشید و
مدارس ساخته زریا طراف و اکناف عالم فرستاد و مستعداد را طلب
داشت و بابجمله بلاد مالوه در زمان او یونان ثانی گشت –

রাজত্ব তার হাতে সুসংহত হলে তিনি আলিম-ফাযিলদের লালনের চেষ্টা করেন, মাদ্‌রাসা স্থাপন করে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে দেশের নানা অঞ্চল থেকে আলিমদেরকে ডেকে ডেকে আনেন। মোট কথা, তাঁর সময়ে মালওয়া দ্বিতীয় গ্রীসে পরিণত হয়।[৫১]

ঐতিহাসিক কাসিম ফিরিশতা বলেন ঃ

وچوں سلطنت باو قرار گرفت همت بر تربیت علماء وفضلاء
گماشته هرجا از ارباب کمال کسے را می شنید زر قسر ستاده او را
طلب می نمود ، در ولایت خود مدرسه ها ساخت علماء و فضلاء و
طلاب را وظیفها مقرر کرده بافاده و استفاده گردانید، و بالجمل بلاد
مالوه من جمیع الوجوه در ایام و لایت او محسود شیراز و سمرقند
بود –

রাজত্ব তাঁর হাতে সুসংহত হলে তিনি আলিম-ফাযিলদের লালনের হিম্মত করে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে গুণী জনদের খুঁজে আনেন। নিজ রাজ্যে তিনি অনেক মাদ্‌রাসা স্থাপন করে আলিম ফাযিল এবং ছাত্রদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করেন। তাদেরকে শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত করেন। মোট কথা, তাঁর শাসনকালে মালওনা ছিল সব দিক থেকে শীরায ও সমরকন্দের ঈর্ষার বস্তু।

শাদী আবাদ মন্ডুর ধ্বংসাবশেষ আজও তার অতীত ইতিহাসের কাহিনী শুনাচ্ছে অবস্থার ভাষায়।

হিজরী ৮৪৬ সালে সুলতান মাহমূদ যখন চিতৌরে সৈন্য সমাবেশ করেন, তখন সেখানে স্থানে স্থানে অনেক মসজিদ মাদ্‌রাসা -স্থাপন করেন।

মাআদিরে বরীসীতে এ সময় তার বিভিন্ন দেবালয় বিনাশ ও স্থানে স্থানে মসজিদ মাদ্‌রাসা নির্মাণের উল্লেখ আছে।

ঐ বছরই এ অভিযান থেকে ফিরে এসে মালওয়ার রাজধানী শাদী আবাদ (মন্ডুতে) সুলতান মাহমূদ হুশাং-এর শাহী জামে মসজিদের বিপরীত দিকে একটা আযীমুশশান মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। মাআছিরে রহীমীর লেখক এ সম্পর্কে লিখেন ঃ

و سلطان محمود بشادی آباد آمد در ذی الحجمه سال مذکور
مدرسه و مناره هفت منظر در محاذی مسجد جامع هو شنگشاهی
طرح نموده –

উক্ত সালের জিলহজ্জ মাসে শাদীআবাদে আগমন করে সুলতান মাহমূদ হুশাং শাহী জামে মসজিদের বিপরীত দিকে মাদ্‌রাসাও হাফতমনযর মিনার-এর ভিত্তি স্থাপন করেন।

সারেংপুর

সারেংপুরেও মাহমূদ খিলজীর নির্মিত একটা মাদ্‌রাসা ছিল। এর ধ্বংস প্রাপ্ত ইমারতের চিহ্ন এখনো বর্তমান রয়েছে। এখানে পাথরে উৎকীর্ণ একটা লিপিও ছিল। কিন্তু পাথর ভেঙ্গে যাওয়ায় মধ্যখানের অনেকাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যেটুকু পাঠোদ্ধার করা যায় তা এই ঃ

بناء هذه المدرسة فی عهد السلطان الاعظم معین الدنیا والدین محمود شاه الخلجی خلد الله ملکه و سطنته فی عمل ملکه مداریخان، الثانی و العشرین من شهر ربیع الاول سنة سبع و تسعین و ثمان مأة –

মুঈনুদদুনিয়া ওয়াদদীন সুলতানুল আযম মাহমূদ শাহ্ খিলজীর শাসনকালে আল্লাহ্ তাঁর রাজত্ব স্থায়ী করুন-মালেক মাদারী খানের হাতে হিজরী ৮৯৭ সালের রবিউল আউয়াল মাসের ২২ তারিখে এ মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সুলতান মাহমূদের পুত্র সুলতান গিয়াসউদ্দীন নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি দরবারে আমের মতো অন্দর মহলেও একটা শাহী দরবার স্থাপন করেন। পুরুষদের মত নারীরাও এ দরবারে সবপদ অলংকৃত করতো। নারীদের মধ্যে আমীরুল ওমারা, উযীর, উকিল, খাজাঞ্চী ইত্যাদি সব পদই ছিল। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, তা ঐতিহাসিক ফিরিশতার ভাষায় শুনুন ঃ

وهمچینی کنیزاں را صناعت ومیزهاکه در جهاں شائع و متعارف است بیاموخت، چنانچه بعضی را وقاضی و خُواندگی و سازنده و مرنارگ تعلیم فرموده بعضی را زرگری و آهنگری و نمل بافی وتیرگری و کمان گری و کوزه گری وجامه بافی وخیاطی و ترکش دوزی وکفش دوزی ونجاری وکشتی گیری رشعبده بازی را قام منرهاکے دیگر که شرح آں موجب تطویل است یاد داد –

এমনিভাবে তিনি নারীদেরকে বিশ্বে প্রচলিত ও পরিচিত শিল্পকর্ম শিক্ষাদান করেন।

কাউকে লৌহকর্ম ও মখমল বানানো, কাউকে তীর কামান চালনা, কাউকে কুম্ভকর্ম; জামা সেলাইও অন্যান্য সূঁচের কাজ, জুতা সেলাই, সূতার মিস্ত্রী এবং নৌকা

তৈরীর কাজও শিক্ষা দেন। এমন কি যাদুবিদ্যাসহ অন্যান্য এমন শিল্পকর্মও শিক্ষা দেন, যার বিশদ বিবরণ পেশ করলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

তিনি নারীদের একটা সেনাবাহিনী গঠন করে তাদেরকে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেন।

پانصد کنیز ترك را لباس مرداں پوشا پندہ تیراندازی و نیزہ داری بیا موخت والبشار را سپاہ ترك تامیدہ در میمنہ خود جائے داد تانیز ھادر دست گرفتہ ترکش برمیاں بستہ باپستند و پانصد کنیز حبشی را از لباس زناں برآمدہ تفنگ اندازی و شمشیر بازی تعلیم کردہ میسرہ بایشاں حوالہ نمود -

পাঁচশ' তুর্কী রমনীকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে তীর চালনা বর্শা চালনা শিক্ষা দেন। তিনি এদের নাম করন করেন তুর্কী বাহিনী। এবং নিজের ডান পার্শে এদেরকে স্থান দান করেন। হাতে বর্শা আর কোমরে তীর ধারণ করে এরা দণ্ডায়মান হতো, আর পাঁচশ' হাবশী রমনীকে নারীর পোশাক পরিধান করিয়ে যুদ্ধাস্ত্র চালনা শিক্ষা দান করে তাদেরকে বাম পার্শে স্থান দান করেন।

মোট কথা, নারীদের শিক্ষার জন্য তিনি এত সব ব্যবস্থা করেন এবং এজন্য এত নারীর সমাবেশ ঘটান, যার ফলে নারীদের একটা শহর গড়ে উঠে।

তাঁর অন্দর মহলের অনেক নারী ছিল কুরআন মজীদের হাফিয। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, এদের সংখ্যা ছিল সত্তর। কিন্তু ফিরিশতা এদের সংখ্যা এক হাজার বলে উল্লেখ করেছেন, ঐতিহাসিক কাশিম ফিরিশতার ভাষণ ঃ

و ھزار کنیزك حافظ قرآن مجید در حرم داشت بایشاں فرمودہ کہ ھنگام تغیر لباس باتفاق قرآن مجید ختم کردہ بروی دمیدہ باشند

তাঁর হেরেমে কুরআন মজীদের এক হাজার মহিলা হাফিয ছিলেন। এদের প্রতি নির্দেশ ছিল, পোশাক পরিবর্তন কালে সকলে এক সঙ্গে কুরআন মজীদ খতম করে বাইরে বেরিয়ে আসার।

এ সব কিছু ছিল জীবনের কর্মকান্ডে পুরুষের সহায়ক নারীর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে। কারণ, তিনি মনে করতেন যে, নারীদেরকে অজ্ঞ-অশিক্ষিত ও অকর্মণ্য রেখে সমাজের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি-অগ্রগতি কিছুতেই সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে তিনি

ছিলেন রাত্রিযাপনকারী দরবেশ সাধক ও আল্লাহ্ ভীরু পরহেযগার বাদশাহ। ঐতিহাসিক কাসিম ফিরিশ্তা তাঁর সম্পর্কে লিখেন ঃ

چوُن یك پاس از شب ماندے کم برینندگی جهان آفریں بسته بادائے لو ازم عبادت پر داختے و جبین عجز وانکسار بر زمن نیاز سوده مطالب و مأرب خود از در گاه احدیث در یوزه کردے و باهل حرم نیز مبالغه فرموده بود که جهت نماز تهجد اور بیدار می کرده باشند و عند الاختیاج اب یر روے او می پاشیده باشند واگر در خواب گراں باشد بزور بجنباند - واگر بآں هم بیدار نشود دستش گرفته بر خیز انند و نیر با نزدیکاد فرموده بود که در وقت عشرت و مشغولی بسخنان دنیا هرچه که رسم کفن برو فهاده بودند - ینظرش می آو ردند قامتنبه شده عبرت گرفته ز مجلس بر می خواست و قجدید ومنو کرده باستغفار و توبه و انابت می پرداخت و در مجلس او املانا مشروع و انچه غم اورد نمی گفتند و بمسکرات هر گز رغبت نمی نمود -

---রাতের এক প্রহর অতিক্রান্ত হলে বিশ্বজাহানের স্রষ্টার বন্দেগীতে কোমর বেঁধে প্রয়োজনীয় ইবাদত সম্পন্ন শেষে বিনয় আর আকুতির সাথে মাটিতে মাথা পেতে নিজের আকাংখা অভিপ্রায় সম্পর্কে একক পরওয়ারদিগারের দরবারে মিনতী জানাতেন। ঘুমানোর আগে হেরেমবাসীদেরকে তাকীদ দিয়ে বলে রাখতেন, তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য তাঁকে যেন তুলে দেয়া হয়। প্রয়োজনে তাঁর মুখে যেন পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকলে যেন সজোরে নাড়া দেওয়া হয়। এতেও না জাগলে হাত ধরে টানবে। নিকটের লোকজনকে বলে রাখতেন যে, দুনিয়ার হাসি-ঠাট্টায় মশগুল হয়ে পড়লে কাফনের কাপড় যেন তার সামনে হাযির করা হয়, যাতে তিনি সচকিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে মজলিস ছেড়ে চলে যেতে পারেন–নতুন করে ওযু করে নিয়ে তওবা ইস্তিগফার করে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যার্বতন করতে পারেন। তাঁর মজলিসে শরিআত বিগর্হিত কোন কথাবার্তা হতো না। কারো মনে ব্যথা লাগতে পারে, এমন কথা তিনি বলতেন না, নেশা সৃষ্টি করতে পারে এমন বস্তুর প্রতি আদৌ তাঁর কোন আসক্তি ছিল না।'

ভেবে দেখার কথা যে, যাঁর জীবনধারা এমন, তিনি কত বড় দরবেশ চরিত্র ও আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তি হতে পারেন। এমন চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি বর্তমানের রাজা–বাদশাহদের মধ্যে তো দূরের কথা, সুফী সাধকদের মধ্যেও হাজারে এমনকি দু'হাজারে একজন পাওয়া যেতে পারে।

জাফরাবাদ

সুলতান গিয়াসউদ্দীন খিলজী জাফরাবাদ নলচায় একটা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।

এ মাদ্‌রাসাটি দ্বিতীয় সুলতান মাহমূদের শাসনকাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। মালওয়া প্রদেশের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে উজ্জ্বয়িনী মাদ্‌রাসার নামও উল্লেখযোগ্য। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এ মাদ্‌রাসার ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত বিগত শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ১২৯৮ হিজরীতে ফার্সী ভাষায় রচিত 'তুযুকে আফগানী' (تزك افغانى)-তে এ মাদ্‌রাসা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"এখানে শাহী আমলের একটা 'আলীশান মাদ্‌রাসা ছিল। এর হুজরাগুলো এখন পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। আমি সেখানে লোককে গরু বাঁধতে দেখেছি। মাদ্‌রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট মসজিদে দেখেছি তৃণ গুল্মে তা ভর্তি হয়ে রয়েছে।

মুলতান ও উচ্‌-এর মাদ্‌রাসাসমূহ

মাদ্‌রাসায়ে ফীরূযী এ নামে উচ্‌-এ একটা মাদ্‌রাসা ছিল। মাদ্‌রাসাটির প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠা সাল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। অবশ্য এতটুকু জানা যায় যে, নাসিরুদ্দীন কুবাচার শাসনামলে অর্থাৎ হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে মাদ্‌রাসাটির অস্তিত্ব ছিল। 'তবকাত-ই-নাসিরীর' রচয়িতা লিখেন যে, নাসিরুদ্দীন হিজরী ৬২৪ সালে এ মাদ্‌রাসার দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করেন। তাঁর ভাষায় ঃ

و درین سال (یعنی اربع و عشرین و ستمأه) درماه ذی الحجة
مدرسة فیروزی واچه حواله این داعی شد -

-এ বছর (অর্থাৎ ৬২৪ সাল) যিলহজ্জ মাসে উচ্‌-এর মাদ্‌রাসা ফীরূযী-এ মুবল্লিগের হাতে ন্যাস্ত করা হয়।৫২ নাসিরুদ্দীন কুবাচা ছিলেন কুতুবদ্দীন আইবকের পক্ষ থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে মুলতান ও উচ্‌-এর শাসনকর্তরূপে নিয়োজিত। তাঁর শাসনামলে মাওলানা কুতুবদ্দীন কাশানী মুলতান আগমন করলে তাঁকে কেন্দ্র করে একটা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। মাওলানা দীর্ঘদিন এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। ফিরিশতা লিখেন ঃ

چوں مولانا قطب الدین کاشانی از ماوراء النحر بملتان رسیده
شاه ناصر الدین قباچه والی ملتان سرائے با مدرسه برائے او بنا

نمود، و مولانا که علامه روزگار بودند بامداد در اں مدرسه نماز گزارده بدرس گفتن به پر داخت -

(فرشته ذکر بهاو الدین زکریا ملتانی)

মাওলানা কুতুবদ্দীন কাশানী মাওয়ারা উন নাহর থেকে মুলতান পৌঁছলে মুলতান-এর শাসনকর্তা শাহ নাসিরুদ্দীন কুবাচা তাঁর জন্য একটা সরাই মাদ্‌রাসার সাথে স্থাপন করেন। মাওলানা ছিলেন তাঁর সমসাময়িক যুগের বড় আলিম। সালাতের পর তিনি মাদ্‌রাসায় পাঠদান করতেন।

মুলতানের সুলতানদের মধ্যে হুসাইন শাহ লংকা ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট পৃষ্ঠপোষক। তিনি জ্ঞানীগুণী ও লেখক গ্রন্থকারদেরকে আর্থিক সাহায্য, বৃত্তি ভাতা ও পদমর্যাদা দিয়ে সর্বদা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে তাঁর রাজ্যে আলিম ফাযিলদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আশেপাশের রাজ্যগুলোর মধ্যে জ্ঞান চর্চার দিক থেকে মুলতান অনন্য মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠে। শাহ হুসাইন লংকা অনেক মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। সেকালের মশহুর আলিমগণ এসব মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। একটা ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আস্তাভাজন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গুজরাট প্রেরণ করেন সেখানকার ইমারত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য। তিনি ফিরে এসে জানান যে, শাহ হুসাইন-এর এতসব সম্পদ ও পাচুর্য থাকা সত্ত্বেও গুজরাট রাজ্যের অনুরূপ ইমারত নির্মাণ করতে তিনি সক্ষম নন। এতে বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুন্ন হন। কিন্তু উযীর তাঁকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, গুজরাট ইমারতের জন্য গর্ব করতে পারলেও মুলতানও তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য গর্ব করতে পারে। ফিরিশতা লিখেন ঃ

چوں قاضی از گجرات بملتان آمد بعد از ادائے رسالت خواست که شمه از خوبیهائے منازل شاهان گجراتِ معروض داودیس گفت که ربان در بیان توصیف آں عمارات لال است لیکن گستاخی نموده بعرض می رسانم که اگر محاصول یکساله تمام مملکت ملتان بتعمیر مثل قصرے آزان تصور خرچ شود معلوم نیست که با تمام رسد، سلطان از شنیدن این سخن مغموم و محزون گشت، عماد الملك تولك که شعل وزارت باو تفویض بود قدم جرآت پیش نهاده مغروض

داشت که بقائے ملك تاقیامت مقرون باد، سبب حزن معلوم نیست، گفت باعث حزن این است که لفظ شاهی برمی اطلاق نموده اندواز معنی شاهی محروموم، و با وجود آن حشر من روز قیامت به بادشاهان خواهد بود، عماد الملك تولك گفت، خاطر شاه ازیں رهگذر مگذر مکدر و ملول نباشد زیواکه حق سبحانه تعالی هر مملکتے را بفضیلتے مخصوص ساختہ که آن در مملکت دیگر عزیز و محترم است، مملکت گجرات و دکن و مالوه و بنگاله اگر چه زرخیز است واسباب تنعم آنجا بروجه احسن میشود، واما مملکت ملتان حردم خیز است چه بزرگان ملتان هرجاکه رفتند معزز و محترم گشتند والحمد لله والمنه که از طبقه علیه شیخ الاسلام شیخ بهاء الدین زکریا قدس الله سره چند کس در ملتان حاضر اندو از طبقه علماء مثل مولینا فتح الله شاگرد مولینا عزیز الله از خاك هاك ملتان مخلوق شده اند که اکثر هندوستان بوجود ایں عزیز ان افتخار کند –

(جلد دوم ذکر حسین نکا)

"কাযী গুজরাট থেকে মুলতান ফিরে এসে দূতের প্রয়োজনীয় শিষ্টাচার পালন শেষে সেখানকার বাদশাহদের প্রাসাদের সৌন্দর্য বর্ণনায় অভিপ্রায় নিবেদন করে বলেন, সে সব প্রাসাদের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে ভাষা অক্ষম। কিন্তু গোস্তাখী করে আমি আরয করব যে, গোটা মুলতানের এক বছরের সমস্ত আমদানী ব্যয়ে অনুরূপ একটা প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভব হবে কি না, তা' বলা কঠিন। সুলতান এ কথা শুনে বিষন্ন ও মনঃক্ষুণ্ন হন। ইমাদুল মুলক তোলক ছিলেন 'উযীরের দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি সাহস করে আরয করেন, আপনার রাজত্ব কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হোক! আপনার মনক্ষুণ্ন হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে, জানি না। তিনি বলেন, আমার মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ এই যে, আমাকে বাদশাহ বলে অভিহিত করা হয়। অথচ আমি শাহ শব্দের তাৎপর্য থেকে বঞ্চিত। তবুও কিয়ামতের দিন বাদশাহদের সাথে আমার হাশর হবে। ইমাদুল মুলক তোলক বলেন, এজন্য বাদশাহর মনঃক্ষুণ্ন হওয়া সমীচীন নয়।

কারণ মহান আল্লাহ্ তা'আলা এক একটি রাষ্ট্রকে এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছেন। এ বৈশিষ্ট্য অন্য রাষ্ট্রের কাছে প্রিয় ও সম্মানার্হ। গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, মাল্ওয়া ও বাংলাদেশ শস্য শ্যামল রাষ্ট্র হলেও বরং সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় উপকরণ সে সব দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমানে থাকলেও সুলতানের রাজ্য হচ্ছে প্রচুর কৃতী সন্তানের জন্মস্থান। মুলতানের বুযুর্গরা যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই প্রকৃত মর্যাদা লাভ করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ্, শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু-র মতো কয়েকজন লোক মুলতানে বর্তমান আছেন। মওলানা আযীযুল্লাহ্র শাগরিদ মওলানা ফাতহুল্লাহর মত বিশিষ্ট আলিম মুলতানের মাটিতে জন্ম নিয়েছেন। এঁদের জন্য গোটা হিন্দুস্তান গর্ব করতে পারে।[৫৪]

কাশ্মীরের মাদ্রাসাসমূহ

সুলতান সিকান্দার (মৃত্যু ৮১৯ হি.) ছিলেন কাশ্মীরের বিদ্যোৎসাহী বাদশাহ। তাঁর শাসনকালে কাশ্মীরের জ্ঞান চর্চা ইরাক খোরাসানের সমপর্যায়ের এসে দাঁড়িয়েছিলো। জ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আনুকূল্য দিকবিদিক থেকে আলিমদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে। এর ফলে সেখানে জ্ঞানের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। দুঃখের বিষয়, এ সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায় না। ঐতিহাসিক ফিরিশতা সংক্ষেপে উল্লেখ করেন, যা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ঃ

و سلطان سکندر بمرتبه سخاوت داشت که از شنیدن آوازه آن دانشمندان عراق وما وراء النهر بملاز متش آمدند و علم و فضل و اسلام در مملکت کشمیر رواج تام پیدا کرده نمونه عراق وخراسان گردید - شاه از جمله علماء سید محمد فام عالمے راکه سر آمد روزکار بود بسیار تعظیم می نمود - و آداب دین ازوے می آموخت -

দানশীলতায় সুলতান সিকান্দারের একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাঁর এ সুখ্যাতির কথা শুনে ইরাক, খোরাসান এবং মাওরা-উন-নাহরের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা তাঁর কাছে এসে চাকরি গ্রহণ করেন। কাশ্মীরে ইল্ম, ফযল এবং ইসলামের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়ে ইরাক এবং খোরাসানের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। বাদশাহ সমস্ত আলিমদের মধ্যে সাইয়্যিদ মুহাম্মদকে শ্রদ্ধা করতেন সবচেয়ে বেশী। ইনি ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান আলিম। বাদশাহ তাঁর কাছ থেকে দীনের রীতিনীতি শিক্ষা করেন।[৫৫] কাশ্মীরের এ বিদ্যোৎসাহী বাদশাহ হিজরী ৮১৯ সালে ইনতিকাল করেন। সুলতান যায়নুল আবেদীন হিজরী ৮২৬ সালে সিংহাসনে বসেন। সুব্যবস্থাপনা দ্বারা তিনি

সর্বদিক দিয়ে দেশের উন্নতি সাধন করেন। কাশ্মীরে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিহাস প্রণয়নের একটা বিভাগ ছিল। সুলতান যায়নুল আবেদীনের শাসনামলে একজন হিন্দু লেখক 'রাজ তরঙ্গিনী' (راج ترنگنی) নামে কাশ্মীরের বিস্তারিত ইতিহাস প্রণয়ন করেন এ বিভাগেরই উদ্যোগে। সুলতান অনুবাদ বিভাগও স্থাপন করেন। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে ঃ

سلطان (زین الغابدین) دانش

منش وخرد پژوده بود .... وفراوان نامه از عربی و کشمیری

و هندی ترجمه کرد

(ص ۱۸۵ جلد دوم)

সুলতান (যায়নুল আবেদীন) ছিলেন প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। আরবী, কাশ্মীরী এবং হিন্দী ভাষা থেকে তিনি ফরমাননামা অনুবাদ করেন।৫৬ কাশ্মীরে মাদ্‌রাসা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা না গেলেও এমন জ্ঞানী বাদশাহ্ শিক্ষা বিস্তারের মত প্রয়োজনীয় বিষয় উপেক্ষা করে যাবেন, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি কোন চেষ্টা করেননি। এটা হতে পারে না। কাশ্মীরের নৃপতি হুসাইন চিক হিজরী ৯০৪-৫ সালে সেখানে একটা বড় মাদ্‌রাসা স্থাপন করে বড় বড় আলিম-ফাযিলকে সমবেত করে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচেষ্টা চালান। এ বিদ্যোৎসাহী নৃপতি অধিক সময় কাটাতেন আলিম-ফাযিলদের খিদমতে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার ব্যয় আলিম ফাযিলদের সাহায্যের জন্য যায়নপুর নামে একটা বড় পরগণা জায়গীরস্বরূপ নির্দিষ্ট করে দেন। ফিরিশতা লিখেন ঃ

وحسین چك مدرسه بنا نموده باعلماء وصلحاء آنجا محبت می

داشت و پرکنه زین پور را بجاگیر این طائفه مقرر کرد -

....

এবং হুসাইন চিক এক মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি সেখানে উলামা-সুলাহাদের সংসর্গে কাটাতেন। যায়নপুর পরগণাকে এ শ্রেণীর লোকের জায়গীর নির্ধারিত করেন।৫৭ সম্রাট আকবরের শাসনামলে হুসাইন খানকে কাশ্মীরের শাসন কর্তা নিযুক্ত করা হয়। হুসাইন খান ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। তিনি সেখানে অনেক মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করেন এবং আলিম ও ছাত্রদের জন্য আসইয়াপুর নামে একটি পরগণা ওয়াক্‌ফ করে দেন (মাআসিরে রহীমী)।

গুজরাটের মাদ্‌রাসাসমূহ

মুসলিম শাসনামলে গুজরাটে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এখানে অনেক মাদ্‌রাসা ছিল। আর এর বিশেষ কারণ ছিল এই যে, এখানকার অধিকাংশ শাসনকর্তাই ছিলেন বিদ্যানুরাগী। গুজরাটের সুলতানদের মধ্যে সুলতান মাহমূদ পেগডা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। হিজরী ৮৬৩ সাল থেকে ৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। আলিম-ফাযিলে তাঁর দরবার পরিপূর্ণ থাকতো। তাঁর শাসনামলে সেখানে বড় বড় ইমারত নির্মিত হয়। এ সবের মধ্যে মাদ্‌রাসাও ছিল। 'তারীখে মিরআতে আহমদী' (تاریخ مرات احمدی)-এর লেখক লিখেছেন যে, ইনি মুসাফিরদের আরামের জন্য সরাইখানা, ছাত্রদের জন্য মাদ্‌রাসা এবং মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন।

মাদ্‌রাসা-ই সাইফ খান

'মিরআতে আহমদীর' রচিয়তা আরও লিখেন যে, গুজরাটের সুবাদার মুহাম্মদ সফীর লকব ছিলো সাইফ খান। তিনি আহ্‌মদাবাদের 'আর্ক' দুর্গের ফটকের সামনে একটা আযীমুশ্‌শান সুদৃশ্য মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্‌রাসাটির নাম ছিলো মাদ্‌রাসাতুল উলামা। নীচের শ্লোক থেকে জানা যায় যে, মাদ্‌রাসাটির প্রতিষ্ঠাকাল ছিল হিজরী ১০৩২ সাল।

سال تمام معمار قضا جستم و گفت - مسجد و مدرسه و دار
شفائے آباد

বিধাতার কাছে জিজ্ঞাসা করি সমাপ্তির বছর সম্পর্কে ঃ তিনি বললেন, মসজিদ-মাদ্‌রাসা ও দারে শেফায়ে আবাদ। (১০৩২ হি.)

মাদ্‌রাসায়ে শায়খুল ইসলাম

শায়খুল ইসলাম খেতাবে বিখ্যাত কাযী আকরামুদ্দীন খান ব্যক্তিগত ব্যয়ে আহমদাবাদে একটা আলীশান মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এতে ব্যয় হয় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা। হিজরী ১১০২ সালে শুরু করে ১১১১ সালে এ মাদ্‌রাসার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। মাদ্‌রাসার পার্শ্ববর্তী দোকানপাঠ ছাড়াও এজন্য দু'টো গ্রাম ওয়াক্‌ফ ছিল। মাওলানা নূরুদ্দীন গুজরাটী ছিলেন এ মাদ্‌রাসার মশহুর মুদাররিস।[৫৮]

মাদ্‌রাসা-ই- সরখীয

সরখীযের যেখানে শায়খ আহমদ কাহতুর মাযার রয়েছে, সেখানে একটা বড় মাদ্‌রাসা ছিল। মাযারের ইমারত নির্মাণ করেন মুহাম্মদ শাহ। খুব সম্ভব তিনি মাদ্‌রাসার ইমারতও নির্মাণ করান। মাহমূদ শাহ্‌ মুযাফফর শাহ-এর শাসনামলে ফকীহ আহসানুল 'আরব দাভূলী ছিলেন এ মাদ্‌রাসার একজন মশহুর ওস্তাদ।[৫৯]

মাদ্‌রাসা-ই ওজীহুদ্দীন

আহমদাবাদে আল্লামা ওয়াজীহুদ্দীনের মাদ্‌রাসা সর্বাধিক বিখ্যাত। এখানে ছাত্রদেরকে বৃত্তিও দেয়া হতো। আল্লামা ওয়াজীহুদ্দীন প্রায় ৬৫ বছর এ মাদ্‌রাসায় তালীম দেন। ইনতিকালের পরও এখানকার মাটিতেই শায়িত হন। তারপর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আবদুল্লাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সাদেক খান নামে একজন আমীর মাদ্‌রাসার ইমারত পুনর্নির্মাণ করান। এতে ছাত্রদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের জন্য উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হয়।[৬০]

মাদ্‌রাসা-ই-নহর ওয়ালা

শায়খ হুসামুদ্দীন মুলতানীর মাযারের পাশে নহর ওয়ালার একটা মাদ্‌রাসা ছিল। মওলানা তাজুদ্দীন এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান মুহাম্মদ ইবনে তাজ এ মাদ্‌রাসায় দরস দিতেন। এ বুযুর্গদ্বয় সে যুগের মশহুর ওস্তাদ বলে স্বীকৃত ছিলেন।[৬১]

মাদ্‌রাসা-ই তালাব সরওয়ার খান

নহরওয়ালায় তালাব খান সরওয়ার নামে একটা পুকুর ছিল মনোরম পর্যটন স্থান। এ পুকুরের চার পাশে ছিল আলীশান ইমারতসমূহ-এ সব ইমরাতের মধ্যে একটা মাদ্‌রাসাও ছিল। এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা-সাল এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় না। মাওলানা কাসিম ইবনে মুহাম্মদ গুজরাটী নামক এ মাদ্‌রাসায় একজন সৈয়দের নাম পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন কুতুবদ্দীন আহমদ শাহ-এর যমানার লোক।[৬২]

মাদ্‌রাসা-ই উসমানপুর

সাবর নদীর তীরে একটা গ্রাম ছিল। এ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ উসমান (মৃত্যু হিজরী ৮৬৩ সাল) নিজ নামে এ গ্রামটির প্রতিষ্ঠা করেন। শায়খ উসমান সেখানে একটা মাদ্‌রাসাও স্থাপন করেন। মুহাম্মদ শাফের গুজরাটী ছিলেন শায়খ উসমানের একান্ত ভক্ত। শায়খ তাঁর এ ভক্তকে মাদ্‌রাসার অনুকূলে নানাভাবে ব্যবহার করেন। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই যে, ছাত্রদের শিক্ষার জন্য শাহী গ্রন্থাগারের সমস্ত কিতাব হাসিল করে ওয়াক্‌ফ করে দেন।[৬৩]

সুরাটের মাদ্‌রাসাসমূহ

হাজী যাহেদ বেগ শায়খ জাফর সাদিকের শাসনকালে হিজরী ১০৪১ সালে সাইয়িদ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ আল ইদরুস-এর মাযারের কাছে একটা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এ মাদ্‌রাসায় সুদীর্ঘকাল ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তালিম দেয়া হয়। সুরাটে মারজান শামীর মসজিদ সর্বদা মাদ্‌রাসারূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নবাব যফর ইয়ার খান তাঁর শাসনামলে মাদ্‌রাসাার জন্য একটা খাস ইমারত নির্মাণ করেন।

নবাবের পৌত্র হাজী মিয়ার আমলে এ ইমারতের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। বাদশাহ আলমগীর তাঁর শাসনামলে হিন্দুস্তানের উন্নতির জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক মিঃ কীন 'হিস্টোরী অব দ্য মুগল এমপায়ার' (History of the mughal Empire) এ উল্লেখ করেন ঃ আলমগীর কৃষির প্রভুত উন্নতি সাধন করেন এবং তাঁর রাজ্যত্বসীমার মধ্যে প্রচুর মক্তব-মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। 'তারীখে মিরআতে আহমদী' থেকেও জানা যায় যে, সুবা গুজরাটের দীওয়ান মাকরামাত খানের নামে প্রেরিত এক ফরমানে বাদশাহ আলমগীর নির্দেশ দেন যে, বিজিত রাজ্যের সকল এলাকায় মাদ্‌রাসা স্থাপন করে ছাত্রদেরকে মীযান থেকে কাশ্‌শাফ পর্যন্ত তালীম দিতে হবে এবং সুবাদারের মতামত ও শিক্ষকের সুপরিশ অনুযায়ী তাদেরকে বৃত্তি দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আহমদাবাদ, সূরাট এবং পটন-এ তিনজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এ গ্রন্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিজরী ১০৮৭ সালে আহমদাবাদের 'ভদর' দূর্গের মাদ্‌রাসা, মসজিদ এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

বাদশাহ আলমগীর ছিলেন গণশিক্ষায় অত্যন্ত আগ্রহী। দিকে দিকে মাদ্‌রাসা স্থাপন ছাড়াও শিক্ষক এবং উলামাদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি হিসাবে প্রচুর অর্থ তিনি মঞ্জুর করেন। 'মা'আছিরি আলমগীরী" (مأثر عالمگیری) গ্রন্থের রচয়িতার ভাষায় ঃ

و در جميع بلاد و قصبات این کشور وسیع فضلا و مدرسان را
بوظائف لائقة از روزانه واملاك موظف ساخته برای طلبه علوم
وجوه معیشت درخور حالت واستعداد مقرر فرموده بودند ص٥٢٩

এ বিশাল রাজ্যের সকল শহর এবং কসবায় আলিম-ফাযিল এবং মুদাররিসদের জন্য যথাযোগ্য বৃত্তি এবং ভূ-সম্পত্তি নির্ধারণ করে বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্রদের জন্য তাদের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুপাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়।[৬৬] বাদশাহ আলমগীর গুজরাটের বোহরা সম্প্রদায়ের জন্য সেখানে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। এজন্য উত্তম শিক্ষকদেরকে নিয়োগ করেন। তিনি মাসিক পরীক্ষার রীতির উদ্ভাবন করেন। পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে তাঁকে নিয়মিত অবহিত করা হতো।

শিক্ষা বিস্তারের অন্যান্য মাধ্যম

এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তাকে বিশেষ বিশেষ মশহুর মাদ্‌রাসার ঐতিহাসিক ফিরিস্তিমাত্র মনে করতে হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে মাদ্‌রাসার নাম, প্রতিষ্ঠাতা, স্থান ও অন্যান্য ছোট খাটো বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। মুসলমান বাদশাহগণ উপমহাদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অন্য যেসব উপায় অবলম্বন করেছেন, সে সম্পর্কে এখন কিছু আলোচনা করবো।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করা যায়, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা সে সবের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। অর্থাৎ দেশের সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে দেশের সকল-স্তরের লোক শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে মুসলমান বাদশাহগণ যেসব কীর্তি সাধন করেছেন, তার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ উপরে পেশ করা হয়েছে।পাঠক এক নযরে দেখতে পারেন যে, মুসলিম সুলতানগণ এদেশের প্রতিটি সুবার কেন্দ্রীয় এবং মশহুর স্থানে মক্তব-মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছেন। এসব মক্তব-মাদ্‌রাসার অধিকাংশের ধ্বংসাবশেষ এখনও অতীতের গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আজ শিক্ষা বিস্তারের যত উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে, তন্মধ্যে বিপুলসংখ্যক প্রাথমিক, মাধ্যামিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় সঙ্কোচনকে সবচেয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসু উপায় বলে মনে করা হচ্ছে, কিন্তু এ সবের দ্বারা সাধারণ মানুষের উপকৃত হওয়া নির্ভর করে যাতায়াত ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উপর। বর্তমানে যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়েছে। যে কোন লোক স্বল্প সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এমন কি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু প্রাচীনকালে এ সুবিধা ছিল না। তখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমন ছিলো কঠিন। সেকালে জ্ঞানের বিস্তার এবং গণশিক্ষার প্রসারের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা সম্ভব ছিলো ? সত্য বলতে কি, সেকালে মুসলিম শাসকগণ যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন, তা ছিল সত্যিই প্রসংশনীয়। তাঁদের শুভ প্রচেষ্টা এবং জন কল্যাণমূলক সেবার জন্য অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাতে হয়। দেশের যেখানে যেখানে আলিম ও মুআল্লিমগণ ছিলেন, মুসলিম শাসকগণ শাহী ভাণ্ডার থেকে তাঁদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করেন। ফলে তাঁরা স্ব-স্ব স্থানে সানন্দে ও নিশ্চিন্তে কোন প্রকার বিনিময় আর পারিশ্রমিক ছাড়াই দরস ও তদরীসে মশগুল থাকতেন, শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রচুর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ ছিলো। এসব ওয়াক্‌ফ থেকে তাদের ব্যক্তিগত এবং শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হতো। আলিম-উলামা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এসব বৃত্তিকে সেকালের ঐতিহাসিক পরিভাষায় বলা হতো মদদে-মা'আশ বা জীবিকা সহায়তা।' এর ফলে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক, গণমুখী এবং তৎকালীন অবস্থার বিচারে অত্যন্ত সহজলভ্য। বিগত অধ্যায়ে 'গুজরাটের মাদ্‌রাসাসমূহ শিরোনামে মাকরামাত খানের নামে জারীকৃত বাদশাহ আলমগীরের একটা ফরমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ফরমানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে গোটা দেশে উলামা ও মুদাররিস নিয়োগ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বৃত্তি দানের কথা। মুসলিম শাসকগণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, এ ফরমানটি তারই প্রমাণবহ। সেকালের জীবিকা সাহায্য দানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হতো না। উভয় জাতির

ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের জন্য এ অর্থ মঞ্জুর করা হতো। প্রাচীনকালে মুসলমানদের আলিমগণ ছিলেন একাধারে ধর্মীয় নেতা ও শিক্ষক। তেমনিভাবে হিন্দুদের পণ্ডিত বা গোঁসাইরা ছিলেন একাধারে তাদের ধর্মীয় নেতা এবং শিক্ষক বা গুরু। এ জন্যে সিলসিলার সকল বৃত্তি কার্যতঃ ছিল ধর্মীয় খাদিম মুআল্লিম এবং গুরুদের জন্য সাহায্য সহায়তা এবং গণমানুষের শিক্ষাগত এবং ধর্মীয় দায়িত্বপালনের পৃষ্ঠপোষকতা স্বরূপ। হিন্দু এবং মুসলিম পরিবারসমূহের জন্য আর্থিক সাহায্যের এ ফরমানসমূহ অদ্যাবধি বিভিন্ন পরিবারে মওজুদ রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। উপমহাদেশের ইতিহাস রচিয়তার কাজ হতো উপ-মহাদেশের পূর্ণাঙ্গও বিস্তৃত ইতিহাস রচনার স্বার্থে ইতিহাসের এসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা উপাদান সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করে সংকলন করা।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা

এখন ইতিহাসের বরাতে কয়েকজন মুদাররিস 'আলিমের তালিকা পেশ করা হবে। এ থেকে জানা যাবে যে, এদেশে শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে যেসব প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তাতে সরকার ও ব্যক্তি উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। সরকার এবং সরকারের আমীর-ওমরাহগণ যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, ইতিহাস থেকে যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র উপরে উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষামূলক এবং ধর্মীয় খিদমতের নিমিত্ত মুআল্লিম ও ধর্মের খাদিমদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যেসব সাহায্য-সহায়তা প্রদত্ত হতো, সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

সেসব ওলামাদের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হবে যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির শিক্ষা ও সংস্কারের নিমিত্ত নিজেদের জীবনের এক বিরাট অংশ ব্যয় করে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে এমন কিছু আলিম রয়েছেন, যাদেরকে সরকারীভাবে শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া হতো। কিন্তু এঁদের অধিকাংশই এমন ছিলেন, যাঁদের কোন সাহায্য সহায়তার প্রয়োজন হতো না। তাঁরা নিজেরাই সবদিক থেকে স্বচ্ছল ছিলেন। জনসেবা এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে এঁরা জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গণমানুষের শিক্ষা এবং তাদেরকে আলো দানের কাজে ব্যয় করতেন।

এখানে যেসব আলিমের তালিকা পেশ করা হচ্ছে, তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন সমকালীন যুগের শিক্ষক। অর্থাৎ তাঁদের প্রায় সকলেই একই যুগের লোক ছিলেন। তাই এর প্রায় পুরোটাই একই সময়ের উলামাদের তালিকা। একই সময়ে যখন এত বিপুল সংখ্যক উলামা এ দায়িত্ব পালন করেছেন, তখন ইসলামী যুগের সূচনা থেকে

শেষ পর্যন্ত কতো বেশী সংখ্যক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে থাকবেন তা প্রণিধানযোগ্য। অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ বাদ দিয়ে কেবল 'তারিখে বদায়ূনী' (تاریخ بدایونی) থেকে এ ফিরিস্তী প্রণয়ন করা হয়েছে। 'তারীখে বদায়ুনী' এর অধিকাংশই হচ্ছে সম্রাট আকবরের শাসনামলে বা তাঁর নিকট অতীতের আলিমদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এটাও প্রণিধানযোগ্য যে, সম্রাট আকবরের শাসনকাল মূলতঃ শিক্ষার যুগ ছিল না। সে আমলেই যখন এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ছিলেন, তা'হলে যেসব সম্রাটের শাসনামল ছিলো কার্যতঃ শিক্ষা ও জ্ঞানের যুগ, তাঁদের যুগের অবস্থা সম্পর্কে তাহলে কি বলতে হবে ? ঐতিহাসিক বদায়ুনী লিখেন ঃ

شیخ سعد الله بنی اسرائیل از ارشد تلامذه شیخ اسحاق کا کوست در عین نخاس درس می گفت، تضانیف بسیار مفید و عالی نوشته، از آنجمله شرح بر جؤاهر القرآن امام غزالی نوشت، شیخ عبد الله بدایونی، نعمت علم از اکثر مقتدیان روزگار خویش یافت خصوصا از میان شیخ لادن دهلوی ومیر سید جلال بدایونی که بعد از فنه مرحوم قائم مقام اِو شده سالها در بدایونی درس و افاده فرموده - میاں حاتم سنبهلی شاگرد میاں عزیز الله طلبنی دریں قرں مثل او من حیث الجامعیة عالم جامع المنقول والمعقول نگشته خصوصا در کلام و اصول وفقه و عربیت می گفتند که قریب بچهل مرتبه شرح مفتاح و مطول را از بائے بسم الله تاقائے تمت درس گفته - میاں جمال خان مفتی دهلی، در علوم عقلیه و نقلیه خصوصا فقة و کلام و عربیت و تفسر بے نظیر بود، بر شرحین مفتاح محاکمه کرده و عضدی را که کتاب منتهیانه است می گویند که چهل مرتبه از اول تا آخر درس گفته و همیشه درس گفتے و اناده علوم دینی فرمودے شیخ جلال الدین تهانیسری خلیفه شیخ عبد القدوس گنگوهی جامع علوم ظاهری و باطنی بود بافاضه علوم دینیه و نشر

معارف يقينيه اشتغال داشت - شيخ عزيز الله در علوم ظاهرى هم كامل و مكمل بود و تفسير عرائس و عوارف و فصوص الحكم و شروحش را بتلامذه درس گفتے -

شيخ بهيكن كا كورى سالها بدرس و افاده خلائق استغال داشت، حافظ كلام مجيد بهفت قرائت بود - شاطبى را درس مى گفت -

شيخ الهديه خيرآبادى از علماء متبحر بود در ابتدائے احوال سالها بدرس وافاده گزرانيده وآں قدر مشغولى بعلوم ظاهرى نمود كه بسيار دانشمندان صاحب كمال ازو وارث مانده -

شيخ عبد الغفور اعظم پورى (اسنبهلى) در اكثر اوقات خويش درس علوم دين فرمودى، مياں وجيه الدين احمد ابادى دائم بدرس علوم دينى اشتغال داشت و قدرت بر جمع علوم عقلى و نقلى بمرتبه بود كه كم كتاب درس از صرف هوائى تا قانون شفا و شرح مفتاح و عضدى باشدكم او را درس نگفته -

شيخ اسحاق كاكو لاهورى، اُو اُستاد اكثر علماء مشهور لأهور است مثل شيخ سعد الله و شيخ منور و غير ايشاں در زمان جوانى بيشر مائل و راغب بشكار بود، چنانچه هرگاه از درس فارغ مى باشد باز و جره امثال آں را گرفته بعيدى رفت -

শায়খ ইসহাক কাকো'র অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র শায়খ সা'দুল্লাহ বনী ইসরাঈল জীবনের শেষ মুহূর্তেও দরস দান করে যান। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম গাযালী রচিত 'জাওয়াহিরুল কুরআন'-এর শরাহও এগুলোর অন্যতম। শায়খ আবদুল্লাহ বদায়ূনী তাঁর সমকালের সেরা আলিমদের কাছ থেকে ইলমের নিয়ামত লাভ করেন। বিশেষ করে মিয়া শায়খ লাদিন দেহলভী এবং মীর সাইয়েদ জালাল বদায়ূনীর কাছ থেকে। ওস্তাদের ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বদায়ূনে দরসে নিয়োজিত ছিলেন।

আলীমুল্লাহ তলবনীর শাগরিদ ছিলেন মিয়া হাতেম সম্ভলী। এ যুগে সবদিক বিচারে মা'কূল মানকুলের এত বড় আলিম আর কেউই ছিলেন না। বিশেষ করে কালাম, উসূল, ফিক্‌হ এবং আরবী ভাষায়। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি প্রায় চল্লিশ বার শরহে মিফ্‌তাহ (شرح مفتاح) ও মুতাও-ওয়াল (مطول) বিসমিলাহর বা থেকে তাম্মাত-এর তা পর্যন্ত দরস দেন। দিল্লীর মুফতি মিয়া জামাল খান উলূমে আকলিয়া ও নকলিয়া তথা যুক্তি ও উক্তি নির্ভর জ্ঞান বিশেষ করে ফিক্‌হ, কালাম, আরবী ভাষা এবং তফসীর বিষয়ে ছিলেন অদ্বিতীয় আলিম। তিনি মিফতাহ-এর দু'টি শরাহ্‌ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি চল্লিশ বার শেষ পর্যায়ের কিতাব আযদী'র দারস দান করেন। তিনি সব সময় দরস দিতেন এবং দীনী ইলমের চর্চা করতেন। শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গোহীর খলীফা শায়খ জালালুদ্দীন খানেশ্বরী ছিলেন যাহিরী ও বাতিনী ইলমে সুপণ্ডিত আলিম। দীনী ইলমের চর্চা এবং বিশ্বাস সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। শায়খ আযীযুল্লাহ ছিলেন উলূমে যাহিরীতে সুপণ্ডিত। তফসীরে 'আরায়িস, আওয়ারিফ এবং ফুসুকুল হিকাম এবং এর শরাহর দরস দিতেন ছাত্রদেরকে। শায়খ ভিকন কাকোরী ছিলেন সাত কিরা'তে কালাম মজীদের হাফিয। অনেক বছর ধরে তিনি দরস, রিয়াযত এবং জনসেবায় মশগুল ছিলেন। তিনি শাহেবীরও দরস দিতেন।

শায়খ আল হাদ্‌ইয়া খায়রাবাদী ছিলেন জ্ঞানের সাগর। প্রথম দিকে অনেক বছর তিনি দরসে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি উলূমে যাহিরীতে এতটা আত্মনিয়োগ করেন যে, অনেক জ্ঞানী তাঁর ইল্‌মের উত্তরাধিকারী হয়েছেন।

শায়খ আব্দুল গফুর আযমপুরী (মণ্ডলী) অধিকাংশ সময় উলূম-ই-দীনীর দরস দানে মশগুল থাকতেন। মিয়া ওয়াজীহুদ্দীন আহমদাবাদী আকলী ও নকলী তথা যুক্তি নির্ভর ও উক্তি নির্ভর সকল ইলমে এমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে, ছরফে হাওয়াই থেকে শিফায়ে কানুন এবং শরহে মিফতাহ ও আযদী পর্যন্ত খুব কম কিতাবই এমন ছিল যার দরস তিনি দেননি।

শায়খ ইসহাক কাকো লাহোরী লাহোরের অধিকাংশ মশহুর আলিমের উস্তাদ ছিলেন। শায়খ সা'দুল্লাহ, শায়খ মুনাওয়ার প্রমুখ তাঁরই শাগরেদ ছিলেন। যৌবনে শিকারের প্রতি খুব আসক্ত ছিলেন। দরস থেকে অবসর হয়ে উপকরণ নিয়ে শিকারে বেরোতেন।

'মাআছিরে আলমগীরীর' লেখক হিজরী ১১০৯ সালের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ

ملا ابو القاسم بشرط تدریس روضه والده شاه عالی جاه یك
روپیه یومیه داشت –

মোল্লা আবুল কাসেম শাহ্ আলী জাহ-এর মাতার রওয়ায় দরস দানের শর্তে দৈনিক এক টাকা হারে সম্মানী পেতেন।

ঐতিহাসিক ফিরিশতা মুলতানের নৃপতি দ্বিতীয় হুসাইন শাহ-এর আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন যে, একটা গৃহযুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে মওলানা সা'দুল্লাহ লাহোরী তাঁর পরিবারের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন ঃ

چوں حصار مسخر لشکر ارغونیه شد جمع بخانه من در آمدند اولا پدر مراکه مولانا ابراهیم جامع نام داشت و شصت وپنج سال بر مسند افاده قرار گرفتهٔ اقام علوم درس گفته بود و دَر آخر عمر پارسا شده بوده به بند بردند و از صفائے منازل و نزاهت عمارات گمانی ذر داری برده شروع در اهانت گردند - (جلد دوم ص ۳۳۱)

গাওনিয়া বাহিনীর হাতে দুর্গের পতন হলে একদল সৈন্য আমাদের গৃহে প্রবেশ করে। আমার পিতা মাওলানা ইবরাহীম ৬৫ বছর দরসের মসনদে বসে কাটান। তিনি নানা বিষয়ে দরস দেন। শেষ জীবনে দরবেশ হয়ে পরকালের ফিকিরে অতিবিহিত করেন। সৈন্যরা আমাদের ঘর পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর দেখে আমাদেরকে স্বচ্ছল বলে ধারণা করে আমাদের উপর লাঞ্ছনা ও নির্যাতন চলায়। শায়খ নিযামুদ্দীন, (কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয) সম্পর্কে ফিরিশতা লিখেন ঃ গিয়াসুদ্দীন বলবনের শাসনামলে শায়খের উস্তাদ খাজা শামসুদ্দীন খাওয়ারযিমী দিল্লী আগমন করেন। বাদশাহ তাঁকে 'শামসুল মুল্‌ক' খেতাব দেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে উযীরের পদে অভিষিক্ত করেন।" এরপর তিনি লিখেন ঃ (সংক্ষিপ্ত)

وقبل از انکه و زیر شود بدرس اشتغال داشت ، پس شیخ او را دیده درسلك تلامذاش منتظم گشت واو حجرة من داشت که خاصه برائے مطالعش بود و شاگرداں صاحب استعداد سه کس بودند که در آں حجره درس می خواندند و باقی شاگرداں را در صفهٔ درس گفت -

উযীরের পদে অভিষিক্ত হওয়ার আগে তিনি শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শায়খ তাঁকে দেখে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়েন' তার অধ্যয়নের জন্য একটা বিশেষ কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল। শাগরিদদের মধ্যে তিনজন ছিলেন এমন যোগ্যতা সম্পন্ন, যারা এ বিশেষ কক্ষে পাঠ গ্রহণ করতেন। আর অন্যান্য শাগরিদকে দরস দিতেন প্রকাশ্য মজলিশে।[৬৯] উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে,

উপ-মহাদেশে জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধান ও শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এদেশের আলিম সমাজ সরকারী এবং বেসরকারীভাবে কত বড় পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

দেশ-দেশান্তর থেকে ভারতবর্ষে ওলামা-ই-কিরামের আগমন ও শিক্ষার বিস্তার

ইসলামী বিজয়ের সয়লাব যখন এদেশ পানে অগ্রসর হয়, তখন সৈন্যদের পিছু পিছু এক বিরাট সংখ্যক জ্ঞানী-গুণীও এদেশে প্রবেশ করেন। তাঁরা এদেশের চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। দিল্লী বিজয়ের পর একদিকে শাসকদের দরবার সাজানো হয়, অপর দিকে জমানো হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসর। জ্ঞানের প্রতি মুসলিম শাসকবর্গের বিদ্যোৎসাহিতা ও জ্ঞানানুরাগের ফলশ্রুতিতে দূর-দূরান্ত থেকে আলিম উলামাগণ ছুটে এসে দিল্লীতে বসবাস করতে শুরু করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের শাসনামলে শামসুদ্দীন খাওয়ারযিমী, বুরহানুদ্দীন বলখী, নাজমুদ্দীন দামেশ্‌কী, শামসুদ্দীন কাওশজী কামালুদ্দীন যাহিদ এবং বুরহানুদ্দীন বায্‌যায-এর মতো অনেক জ্ঞানী গুণীর সমাবেশ ঘটে। এঁদের উপস্থিতির ফলে দিল্লী হয়ে উঠে শীরায ও বাগদাদের ঈর্ষার বস্তু। মুহাম্মদ শাহ তুগলকের শাসনামলে কাযী আব্দুল মুকতাদির, শায়খ আহমদ থানেশ্বরী, মুঈনুদ্দীন ইমরানী এবং মাওলানা খাসগীর মতো জ্ঞানী ব্যক্তিরাও বর্তমান ছিলেন। আলাউদ্দীন খিলজীর শাসনকালের রাজধানী দিল্লী সম্পর্কে ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বরণী 'তারীখে ফিরূজ শাহী'তে উল্লেখ করেন ঃ

چهل وشش علماء فحول وبے نظیر در دار السلطنت دهلی بودند –

রাজধানী দিল্লীতে ৪৬ জন নযীরবিহীন বিশিষ্ট আলিম বর্তমান ছিলেন। এ বিশিষ্ট আলিমদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ মওলানা ফখরুদ্দীন নাকেলা, কাযী শরফুদ্দীন সরবায়ী, মওলানা নাসিরুদ্দীন গনী, মওলানা তাজুদ্দীন মুকাদ্দিম, মওলানা যহীরুদ্দীন-লং, সদরুশ্‌ শারীয়াহ্‌ মওলানা আলাউদ্দীন, মওলানা নিযামুদ্দীন কালাহী, মওলানা করীমুদ্দীন জওহর প্রমুখ।

সুলতান সিকান্দার লোদীর শাসনামলে দু'জন বড় আলিম মুলতান থেকে দিল্লী এবং সম্ভলে আগমন করেন। এঁরা ছিলেন মা'কূলাত তথা যুক্তি নির্ভর জ্ঞানের উৎস। তাঁরা এদেশে মানতেক বা তর্কবিদ্যা এবং কালাম শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ঐতিহাসিক বদায়ূনী লিখেন ঃ

و از جمله علماء كبار عهل سكندرى شيخ عبد الله طلبنى در دهلى ومولانا عزيز الله در سنبل بودند، و اين هر دو عزيران دو هنگام خرابى ملتان بهندوستان آمده علم معقول دران ديار رواج دادند و

قبل ازین بغیر از شرح شمسیه و شرح مواقف از علم منطق و کلام
درهند شائع نبود –

শাহ সিকান্দারের শাসনামলে অন্যান্য আলিম-এর মধ্যে দিল্লীতে ছিলেন শায়খ আব্দুল্লাহ তলবনী এবং সম্ভলে ছিলেন মওলানা আযীযুল্লাহ। মুলতান ধ্বংসের সময় এঁরা হিন্দুস্থানে আগমন করেন। এঁরা দু'জনে এদেশে যুক্তিবিদ্যার প্রচলন করেন। এঁদের আগে হিন্দুস্তানে মানতিকে 'শরহে শামসিয়া' (شرح شمسیه) এবং ইলমে কালামে 'শরহে মাওয়াকিফ' ব্যতীত অন্য কোন কিতাবের প্রচলন ছিল না।

শায়খ আব্দুল্লাহ্র দরসের মজলিসে বাদশাহ্ সিকান্দার লোদী নিজে যোগ দিতেন। তাঁর যোগ দেয়ার ফলে দরসের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এ কথা চিন্তা করে তিনি গোপনে মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদের এক কোণে গিয়ে বসতেন এবং সেখান থেকেই তিনি মওলানার পুরো লেকচার শুনতেন।

সম্রাট আকবরের শাসনকালে আগমন করেন শাহ্ ফত্হুল্লাহ শীরাযী এবং তিনি আযদুল মুলক (عضد الملك) খিতাব লাভ করেন। আয্দুল মুলক ছিলেন বড় আলিম এবং বিদ্যানুরাগী। এ সময় হাকীম শামসুদ্দীন এবং তাঁর ভাগ্নে হাকীম আলী গিলানী ইলমে তিবব্ বা চিকিৎসা বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করেন। একই সময়ে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী হাদীস-এর প্রচার-প্রসারের কাজে সচেষ্ট ছিলেন।

হিন্দুস্তানের মশহুর আলিম

সম্রাট শাহজাহান এবং সম্রাট আলমগীরের শাসনামলে মীর যাহিদের আবির্ভাব হয় এবং তাঁর প্রচেষ্টায় শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় কাযী মুবারক এবং শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর খান্দানের কথা। এ মশহুর খান্দান থেকেই উদ্ভূত হন শাহ আব্দুল আযীয, শাহ রফিউদ্দীন, শাহ আবদুল কাদির, মওলবী আবদুল হাই, শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল, মওলবী মুহাম্মদ ইসহাক, মওলবী রশীদুদ্দীন, মুফতী সদরুদ্দীন খান (র) প্রমুখ মশহুর উলামা ও মুদাররিসিন।

গুজরাটে (মাজমাউল বিহার-এর লেখক) শায়খ তাহির ফাতানী, শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন আলাবী গুজরাটী এবং মোল্লা নূরুদ্দীন প্রমুখ আলিম জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন। কাযী যিয়াউদ্দীন নয়ূতনী গুজরাটে পৌঁছে শায়খ ওমীহুদ্দীনের কাছ থেকে ফয়েয লাভে ধন্য হন। তাঁর কাছ থেকে শায়খ জামাল এবং শায়খ কামালের নিকট মোল্লা লুৎফুল্লাহ্ বিদ্যাভ্যাস করেন। তাঁর শাগরিদদের মধ্যে 'নূরুল আনওয়ার' (نور الانوار) গ্রন্থের রচয়িতা মোল্লা জীউন, মোল্লা আলী আযগর', মোল্লা মুহাম্মদ আমান এবং কাযী আলীমুল্লাহ্ অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এঁদের সকলেই দরসে বিয়োজিত ছিলেন।

জ্ঞানের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে লাহোর দিল্লীর চেয়ে অগ্রগামী। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য দিল্লীর তুলনায় লাহোরের জ্ঞানের প্রদীপ নিভুনিভু হয়ে যায়। অবশেষে আর একবার লাহোরে জ্ঞানের বাতি জ্বলে উঠে। এর পিছনে ছিলেন কামালুদ্দীন কাশ্মীরী, জালালুদ্দীন তল্লা, মুফতী আবদুস সালাম এবং মোল্লা আব্দুল হাকীমের মতো নামকরা 'উলামাদের অস্তিত্ব। এসব বুযুর্গ-এর ফয়েয হাজার হাজার জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণ করেন।

শারকী বংশের সুলতানদের বিদ্যাৎসাহের ফলে জৌনপুরে শায়খ আবুল ফাতাহ্ শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী, উস্তাদুল মালিক মুহাম্মদ আফযাল, মওলানা আল্লাহ্দাদ, 'শামসে বাযেগা'র রচয়িতা মোল্লা মাহ্মূদ, মুফতী আবদুল বাকী এবং দেওয়ান আবদুর রশীদের মতো জ্ঞানীগুণীদের উদ্ভব হয়। এঁদের ফয়েযের সিলসিলা গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

এলাহাবাদে শায়খ মুহিবুল্লাহ, কাযী আসিফ, শায়খ আফযাল, শাহ খূবুল্লাহ, শায়খ মুহাম্মদ তাহের, হাজী মুহাম্মদ ফাখের যায়ের, মওলবী বরকতুল্লাহ এবং মওলবী জারুল্লাহ্র মতো যুগের গর্ব আলিমগণ দরস ও তদরীসের আসর সরগরম রাখেন। এর ফলে প্রায় এক শতাব্দী ধরে সেখানে জ্ঞানের উল্লেখযোগ্য রওনক ছিল।

লক্ষ্নৌ সর্ব প্রথম শায়খ আ'যম জৌনপুর থেকে ফয়েয লাভ করে আসেন। এরপর শাহ পীর মুহাম্মদ দরস দান শুরু করেন। তাঁর শাগরিদ মোল্লা গোলাম নক্শন্দ এ সিলসিলাকে আরো প্রসারিত করেন। ঠিক এ সময়ে শায়খ কুতুবুদ্দীনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইনি ছিলেন মাওলানা আবদুস সালাম দেওভী এবং মুহিব্বুল্লাহ ইলাহাবাদীর শিষ্য শাগরেদদের ধারায় একজন নামকরা শিক্ষক তাঁর বংশের কৃতি সন্তান মোল্লা নিযামুদ্দীন জ্ঞানের বন্যা বইয়ে দেন। তাঁর বদৌলতে লক্ষ্নৌ জ্ঞানের পীঠস্থানে পরিণত হয়। তিনি যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন, গোটা ভারতবর্ষ তা গ্রহণ করে। এ সিলসিলার মোল্লা হাসান, বাহ্রুল উলুম, মোল্লা মুবীন, মওলবী ওলীউল্লাহ, মুফতী যহুরুল্লাহ, মওলবী নঈমুল্লাহ, মওলবী আবদুল হাকীম, মওলবী আবদুল হালীম প্রমুখ সেকালের খ্যাতনামা উস্তাদগণের উদ্ভব ঘটে।

এ খান্দানের ছাত্রদের মধ্যে কুতুবুদ্দীন গোপামুন্দী, আমানুল্লাহ বেনারসী, কুতুবুদ্দীন শামসা আবাদী, মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী, মওলবী হামদুল্লাহ মওলবী ফয্লে ইমাম এবং মওলবী ফয্লে হক প্রমুখ হিন্দুস্তানের দিকে দিকে জ্ঞানের বিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা সাধনা করেছেন। তাঁদের চেষ্টার যে ফল অদ্যাবধি বর্তমান রয়েছে, তা থেকে, তাঁদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

প্রাচীন আরবী পাঠ্যসূচী

এখন অবশিষ্ট রয়েছে এ প্রসঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় –'আরবী পাঠ্যসূচী। এ সম্পর্কে আলোচনা না করলে এ নিবন্ধ যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। হিজরী ১৩২৭ সাল মুতাবিক ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে 'আন-নাদওয়া' পত্রিকায় নাদওয়াতুল 'উলামা লক্ষ্ণৌর নাযিম আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ মওলানা সায়্যিদ আবদুল হাই 'ভারতবর্ষের পাঠ্যসূচী' শিরোনামে একটা গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখেন। ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞানী গুণীদের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি একমাত্র বিশেষজ্ঞ। তিনি আরবী ভাষায় কয়েক ভলিউমে এদেশের আলিমগণের বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। আমি তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এর চেয়ে বেশী শ্রমলব্ধ গবেষণার নমুনা পেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, অপ্রকাশিত হওয়ার কারণে এ মূল্যবান কিতাবটি জনসাধারণের সম্মুখে আসেনি। ভারতবর্ষে পাঠ্যসূচী নিবন্ধে তিনি লিখেন ঃ

"পাঠ্যসূচীকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করাই বিধেয়। প্রতি পর্যায়ে যেসব কিতাব পাঠ্যভুক্ত ছিলো, তাও সন্নিবিষ্ট করা হবে। এ সব সংগ্রহ করতে হয়েছে ইতিহাস, জীবন চরিত, মাশায়েখদের তবকাত, কবিদের আলোচনা এবং মকতুবাত ও মলফূযাত থেকে। এমনিতে এটা ক্ষুদ্র কাজ মনে হবে। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থের হাজার হাজার পৃষ্ঠা ঘাটাঘাটির পর আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা-ই পাঠক মহলের সামনে পেশ করছি।" সত্য বলতে কী, উপরোক্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব থেকে প্রতিটি পর্যায়ের পাঠ্যসূচীর যে বিস্তৃত বিবরণ তিনি উপস্থাপন করেছেন, তার ওপর আর কিছু সংযোজন করা দুষ্কর। নিবন্ধকার হিসেবে এ ক্ষেত্রে আমিও নানা ইতিহাস ও জীবন চরিত গ্রন্থ ঘাটাঘাটি করেছি। এত সবের পর আমাকে তাঁর সাথে একমত হতে হয়, আর কিছু সংযোজনের অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে আর চেষ্টা-চরিত্র না করে তাঁর প্রণীত বিবরণটি উপস্থাপন করাই আমি উত্তম মনে করি। তাই প্রায় তাঁর ভাষায়ই পাঠ্যসূচী বিষয়ে এ নিবন্ধ এখানে উপস্থাপন করছি।

প্রথম পর্যায়

হিজরী ৭ম শতকের সূচনা থেকে এ পর্যায় ধরতে হবে। হিজরী দশম শতকে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ পর্যায় বিস্তৃত। এ দীর্ঘ সময়ে নিম্নোক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকে মনে করা হতো পূর্ণত্ব হাসিলের মানদণ্ড ঃ ছরফ, নাহু, বালাগাত, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, মানতিক, কালাম, তাসাওউফ, তাফসীর ও হাদীস।

ইলমে নাহু, (علم النحو) ঃ মিসবাহ (مصباح) কাফিয়া (كافيه) কাযী নাসিরুদ্দীন বায়দাবী রচিত লুবাবুল আলবাব (لباب الالباب) এবং কিছু দিন পরে

কাযী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী প্রণীত 'আল-ইরশাদ' ইলমে ফিক্‌হ্ ঃ হিদায়া উসূলে ফিক্‌হ ঃ "মানার' ও তার ব্যাখ্যা গ্রস্থ এবং উসূলুল বায়দাবী ইলমুত্-তাফসীর ঃ মাদারিকুত তানযীল বায়যাবী ও কাশশাফ।

ইলমুত তাসাওউফ ঃ আওয়ারিফুল মাআরিফ, ফুসূসুল হিকাম, দীর্ঘ দিন পর নাকদুন নুসূস এবং লামআত ও যেসব মাদ্‌রাসায় চালু হয়, সেগুলো খানকার সাথে সংশ্লিষ্ট।

ইলমুল হাদীস মাশারিকুল আনওয়ার, মাসাবীহুস সুন্নাত অর্থাৎ মিশকাতুল মাসাবীহ এর মতন বা মূল পাঠ। আদব বা আরবী সাহিত্যে মাকামাতে হারীরী মুখস্ত করানো হতো। হযরত নিযামুদ্দীন আওউলিয়ার মলফূযাত বা উক্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি শামসুল মুলক উস্তাদ শামসুদ্দীন খাওয়ারেযিমীর কাছে মাকামাতে হারীরী পড়েন এবং এর চল্লিশটি মাকামা তাঁর মুখস্ত ছিল।

ইলমুল মান্‌তিকে শরহে শামসিয়া কালাম-এ 'ছাহায়েফ' এবং কোন কোন মাদ্‌রাসায় আবু শাকূর সালিমীর 'তামহীদ' পড়ানো হতো। এ পর্যায়ে 'উলামায়ে কিরামের অবস্থা থেকে জানা যায় যে, আমাদের কালে যেমন মানতিক-ফালসাফা তথা তর্ক ও দর্শন ফযীলতের মাপকাঠি, তেমনি সেকালে ফযীলত্বের মাপ কাঠি ছিল ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ। হাদীসে কেবল 'মাশারিকুল আনওয়ার' পড়ে নেয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি 'মাসাবীহ' পড়েন তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিশ্বের ইমাম উপাধি লাভের যোগ্য বিবেচিত হতেন।

এ সময়ের পাঠ্যসূচীতে যে বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়, তা ছিলো ভারত বিজেতাদের অভিরুচির প্রতিফলন। ভারতবর্ষে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, তাদের আগমন হয়েছিলো গযনী এবং 'ঘোর' থেকে। সেসব দেশে ফিক্‌হ্ ও উসূলে ফিক্‌হ-এ ব্যুৎপত্তি অর্জন করাটা ছিলো জ্ঞানের রাজ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া। কারণ ফিক্‌হ-এর রিওয়ায়ত বা বর্ণনার স্থান ছিলো সর্বোচ্চ। ইলম-ই-হাদীসের প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হতো না। একটা ঘটনা থেকে এ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। একবার গিয়াসুদ্দীন তূগলকের দরবারে সামা' সম্পর্কে বিতর্ক হয়। এক পক্ষে ছিলেন শায়খ নিযামুদ্দীন আওলিয়া আর অপর পক্ষে দিল্লীর সমস্ত আলিম-উলামা। শায়খ বলেন, আমি প্রমাণ হিসেবে কোন হাদীস উপস্থাপন করলে তারা বড়াই করে বলতো, এ শহরে তো হাদীসের ওপর ফিকহী রিওয়ায়েতকে অগ্রগণ্য মনে করা হয়। কখনো বলতো, এ হাদীস তো ইমাম শাফিয়ীর দলীল। আর তিনি তো আমাদের আলিমদের দুশমন। আমরা এমন হাদীস শুনতে চাই না। শায়খ বলতেন, যে শহরের আলিমদের মধ্যে দাম্ভিকতা ও বিদ্বেষ এ পর্যায়ে পৌঁছেছে, সে শহর কি করে আবাদ থাকতে পারে? তা তো বরবাদ হওয়ার যোগ্য'।[৭০]

যিয়াউদ্দীন বারণী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আলাউদ্দীন খিলজীর, শাসনামলের একটা ঘটানা উল্লেখ করেছেন। মওলানা শামসুদ্দীন তুর্ক নামে একজন মিসরীয় মুহাদ্দিস ভারতবর্ষে ইলম-ই-হাদীসের প্রচলনের জন্য মুলতান পর্যন্ত এসে ফিরে যান। যাওয়ার সময় তিনি বাদশাহকে একটা পত্র লিখে যান। ভারতবর্ষে ইলম-ই-হাদীসের প্রতি আলিম সমাজের উন্নাসিকতা সম্পর্কে এ পত্রে বাদশাহকে তিরস্কার করা হয়। কিন্তু দূনিয়াদার মওলবীরা এ পত্রখানা বাদশাহ্র কাছে পৌঁছতে দেয়নি।

দ্বিতীয় পর্যায়

হিজরী নবম শতকের শেষের দিকে শায়খ আবদুল্লাহ্ এবং শায়খ আযীযুল্লাহ মুলতান থেকে আগমন করেন। প্রথমোক্ত জন দিল্লীতে এবং শেষোক্ত জন সম্ভলে অবস্থান করেন। এটা ছিল সুলতান সিকান্দার লোদীর শাসনকাল। তিনি বুযুর্গদ্বয়কে আন্তরিক অভ্যর্থনা সহকারে বরণ করেন। তাঁদের জ্ঞানগরিমা আর তাঁকে শাহী কদরের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের দিকে দিকে তাঁদের জ্ঞানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা জ্ঞানগরিমা ও ফযীলতের সাবেক মানদণ্ডকে অনেকটা উন্নীত করেন। কাযী আয্‌দ প্রণীত মাতালি ও মাওয়াকিফ (مطالع و مواقف) এবং সাক্কাকীর মিফ্‌তাহুল উলুম (مفتاح العلوم) পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কিতাবগুলো স্বল্পকালের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

এ বুযুর্গদ্বয় সম্পর্কে বদায়ূনীর উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

“মুলতানের ধ্বংসকালে এঁরা দু’জন হিন্দুস্থানে আগমন করে এখানে ইলম-ই-মা’কূলাত তথা যুক্তিবিদ্যার প্রচলন করেন। ইতিপূর্বে মানতিক ও কালাম শাস্ত্রে শরহে শামসিয়া ও শরহে মাওয়াকিফ ছাড়া ভারতবর্ষে অন্য কোন কিতাবের প্রচলন ছিলো না।”

এ যুগেই মীর সাইয়েদ শরীফের শাগরিদগণ শরহে মাতালি‘ (شرح مطالع) এবং শরহে মাওয়াকিফ (شرح مواقف)-এর প্রচলন করেন এবং আল্লামা তাফতাযানীর শাগরিদগণ মুখতাসারুল মা’আনী (مختصر المعانى) এবং মুতাওয়াল (مطول)-এর ভিত স্থাপন করেন এবং তালবীহ (تلويح) ও শরহে আকায়িদে নাসাফী (شرح عقائد نسفى) ও চালু করেন। এ সময় ধীরে ধীরে শরহে বিকায়াহ (شرح وقايه) ও শরহে জামী (شرح جامى) পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

এ যুগের সর্বশেষ কিন্তু সবচেয়ে নামকরা ‘আলিম ছিলেন শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী। তিনি ভারত থেকে ‘আরবে যান, সেখানে তিন বছরকাল অবস্থান করে হারামাইন শরীফাইনের আলিমগণের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করে এ

বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে এ তোহফা নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তিনি এবং তাঁর সন্তানরা এদেশে হাদীস-এর প্রচার-প্রসারের প্রয়াস পান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এ ক্ষেত্রে সফল হতে পারেননি। কারণ, আল্লাহ্ অপর এক বুযুর্গের জন্য এ গৌরব নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কিতাবগুলোর নামের ফিরিস্তি পেশ করা কেবল আলোচনা দীর্ঘায়িত করারই নামান্তর। কেননা প্রথম পর্যায়ে যেসব কিতাবের ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে তার সাথে মাতালি' ও মাওয়াকিফ, এগুলোর শরাহসমূহ মুতাওয়াল, মুখতাছার, তালবীহ, শরহে আকাইদে নাসাফী, শারহ বিকায়াহ ও শরহে জামী-এ ফিরিস্তির সাথে সংযোজন করলে অতি সহজেই এ পর্যায়ের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত হতে পারে।

এ পর্যায়ের 'উলামায়ে-কিরামের অবস্থা থেকে জানা যায় যে, আমাদের যমানায় যেমন সদরা। (صدرا) এবং শামসে বাযিগা (شمس بازغه)-কে সর্বশেষ পর্যায়ের কিতাব মনে করা হয়ে থাকে, তেমনি সেকালে সাক্কাকীর মিফতাহুল উলুম (مفتاح العلوم للسكاكى) এবং কাযী 'আয্‌দ-এর 'মাতালি' ও 'মাওয়াকিফ'কে শেষ স্তরের কিতাব মনে করা হতো। ঐতিহাসিক বদায়ূনী স্থানে স্থানে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। মুফতী জামালুদ্দীন খানের অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেন ঃ

بر شر حین مفتاح محاکمه کرده و عضدی را که کتاب منتهیانه هست می گویند که چهل مرتبه از به اول تا اخر درس گفته -

-"তিনি মিফতাহ-এর দু'টি শরাহর পর্যালোচনা করেছেন। বলা হয়ে থাকে যে, শেষ পর্যায়ের কিতাব 'আয্‌দী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চল্লিশ বার দরস দিয়েছেন।" শায়খ হাতিম সম্পর্কে বদায়ূনী লিখেন ঃ

می گفتند که قریب چهل مرتبه شرح مفتاح و مطول را از بائے بسم الله تا تائے تمت درس گفته وبراین قیاس سائر کتاب منتهیانه-

"বলা হয়ে থাকে যে, প্রায় চল্লিশ বার তিনি মিফ্‌তাহ ও মুতাওয়াল বিসমিল্লাহর 'বা' থেকে তাম্মাত-এর 'তা' পর্যন্ত আনুপূর্বিক দরস দেন। এমনিভাবে সমাপ্তি পর্যায়ের অন্যান্য সমস্ত কিতাব।

তৃতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঠ্যসূচীতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাতে সকলের আকাঙ্খা বৃদ্ধিপায়। ফযীলতের মাপকাঠি আরও উঁচু করার জন্য তাঁরা আকাঙ্খী হয়ে উঠেন। এ

সময় শাহ ফাত্হুল্লাহ শীরাযী হিন্দুস্তান আগমন করেন। দরবারে আকবরীতে তাঁকে 'আয্যুদ মুল্ক খেতাব দিয়ে তাঁর মর্যাদা আরও বর্ধিত করা হয়। তিনি সাবেক পাঠ্যসূচীতে কিছুটা সংযোজন করেন। 'আলিম সমাজ তাঁর এ সংযোজন মেনে নেন। এতে মাদ্রাসায় কিছুটা প্রাণচাঞ্চল্য সূচিত হয়।

–মীর গোলাম আলী আযাদ তাঁর মাআসিরুল কিরাম' পুস্তকে নিম্নোক্ত ভাষায় তা স্বীকার করেন ঃ

تصانیف علمائے متاخرین ولایت مثل محقق دوّ - انی و میر صدر الدین و میر غیاث الدین منصور و مرزا جان میر به هندو ستان آورد ودر حلقه درس انداخت وجم غفیر از خاشیه عقل استفاده کردند و ازاں عهد معقو لات را رواجی دیگر پیدا شد -

–এ সময় মুহাক্কিক দাওয়ানী, মীর সদরুদ্দীন, মীর গিয়াসুদ্দীন মনসূর এবং মির্জা জান মীর-এর রচিত গ্রন্থাবলী ভারতবর্ষে পৌঁছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান করে নেয়। বিপুল সংখ্যক লোক জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে। এ সময় থেকে মা'কূলাত নব পর্যায়ে প্রবর্তিত ও প্রচলিত হয়।

এ সময়ের সর্বশেষ কিন্তু সবচেয়ে নামকরা 'আলিম ছিলেন শাহ ওলী উল্লাহ দেহলভী (ইন্তিকাল ঃ ১১৭৪ হিজরী)। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আল-জুয্উল লাতীফ ফী তারজামাতিল আবদিয-যায়ীফ' (الجزء اللطيف فى ترجمة العبد الضعيف) এ তিনি তাঁর পাঠ্য-পুস্তকগুলো সাজিয়েছেন নিম্নরূপে ঃ

ইলমুন নাহু ঃ কাফিয়া, শরহে জামী, ইলমুল মানতিক, শরহে শামসিয়া, শরহে মাতালি ইলমুল ফালসাফা ঃ শরহে হিদায়াতুল হিকমত ইলমুল কালাম ঃ শরহে আকাইদে নাসাফী, খেয়ালীর হাশিয়াহ শরহে মাওয়াকিফ। ইলমুল ফিকহ ঃ শরহে বিকায়া, হিদায়া, ইলমু উমুলিল ফিক্হ হুসামী ও তাওযীহ-তালবীহ অংশ বিশেষ। ইলমুল বালাগাত ঃ মুখতাসারুল মা'আনী ও মুতাওয়াল। ইলমুল হাইয়াত ওয়াল হিসাব ঃ কিছু কিছু প্রাথমিক কিতাব। ইল্মুত্তিব ঃ আল-কানূন (সংক্ষিপ্ত)। ইলমুল হাদীস ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (সম্পূর্ণ), শামায়েলে তিরমিযী (সম্পূর্ণ), সহীহ বুখারী (অংশ বিশেষ)। ইলমুত্ তাফসীর ঃ মাদারিক ও বায়যাবী ইলমুত তাসাওউফ ওয়াস সুলূক ঃ আওয়ারিফুল মা'আরিফ, রাসায়েলে নকশবন্দিয়া, শরহে রুবাইয়াতে জামী, শরহে লাম্'আত-এর ভূমিকা এবং 'নাকদুন নুসূস'-এর ভূমিকা।

এ পর্যায়ের পাঠ সমাপনান্তে শাহ সাহেব 'আরব গমন করেন এবং সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করে শয়াখ আবু তাহের মাদানীর নিকট হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ

করেন। দেশে ফিরে এসে পূর্ণোদমে তিনি হাদীস-এর প্রচার-প্রসারের কাজ আত্মনিয়োগ করেন। অল্প দিনের মধ্যে এখানে হাদীস চর্চায় মন্দাভাব কেটে যায়। শুরু হয় বিপুল সাড়া আর উদ্দীপনা। এখনো তার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। তখন থেকে এ দেশে 'সিহাহ সিত্তার' দরসের প্রচলন হয়। শাহ সাহেব এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তানগণ বিরাট পরিশ্রম আর কষ্ট স্বীকার করে এর প্রচলন করেন। এ জন্য তাঁরা ব্যয় করেন তাঁদের মুল্যবান জীবনের এক বিরাট অংশ। শাহ সাহেব একটা নতুন পাঠ্যসূচীও প্রণয়ন করেন। কিন্তু সে সময় যেহেতু জ্ঞানের কেন্দ্র দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত হয়ে পড়েছিল, দেশের সকল মাদ্রাসায় মানতিক হিকমত (তর্কবিদ্যা ও বিজ্ঞান) স্থান করে নিয়েছিলো, তাই শাহ সাহেবের এ নতুন পাঠ্যসূচী জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

চতুর্থ পর্যায়

হিজরী দ্বাদশ শতকে শুরু হয় চতুর্থ পর্যায়। এ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মোল্লা নিযামুদ্দীন। তিনি এমন শক্ত হাতে এর ভিত্তি স্থাপন করেন যে, দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে কোন ভাটা পড়েনি।

মোল্লা নিযামুদ্দীন ছিলেন শাহ ওলীউল্লা দেহলভীর সমসাময়িক। এ সময়ে যে সব পাঠ্য পুস্তক প্রচলিত ছিলো, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মোল্লা নিযামুদ্দীন এ পাঠ্যসূচীতে অনেক সংযোজন–পরিবর্ধন করেন। এ সংযোজনের পর পাঠ্যসূচীর যেরূপ দাঁড়ায় তা এই ঃ ইলমুস ছারফ ঃ মীযান, মুনশায়িব, সারফে মীর, পানজ গানজ, যুবদাহ, ফুসূলে আকবরী, ও শাফিয়াহ।

ইলমুন নাহু ঃ নাহুমীর, শরহে মিয়াতে আমিল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া ও শরহে জামী।

ইলমুল মানতিক ঃ সুগরা, কুব্‌রা ঈসাগুজী, তাহযীব, শরহে তাযীব এবং সুল্লামুল উলুম, কুত্‌বী (মীর কুতবীসহ)। ইলমুল হিকমত ঃ মাইবুযী, ছদরা, ও শামসে বাযিগাহ। রিয়াযীতে ঃ খুলাসাতুল হিসাব, তাহরীরে ওকলীদাস ঃ ইউক্লিডের জ্যামিতি, প্রথম অধ্যায়, তাশরীহুল আফলাক, রিসালায়ে কাওশজিয়া এবং শরহে চিগমিনী প্রথম অধ্যায়।

ইলমুল বালাগাত ঃ মুখতাসারুল মা'আনী, মুতাওয়াল। ইলমুল ফিকহ ঃ শরহে বিকায়াহ প্রথম দু'খণ্ড, হিদায়াহ শেষ দু'খণ্ড। ইলমু উসুলিল ফিকহ ঃ নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ তালবীহ এবং মুসাল্লামুস সাবুত, ইলমুল কালাম ঃ শরহে আকায়িদে নাসাফী, শরহে আকায়িদে জালালী মীর যাহেদ এবং শরহে মাওয়াকিফ, ইলমুত তফসীর (علم التفسير) ঃ জালালাইন, বায়যাবী।

'ইলমুল হাদীস ঃ মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ

এ পাঠ্যসূচীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ছাত্রদের মধ্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং অধ্যয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা হয়েছে বেশি। গভীরভাবে এ পাঠ্যসূচী অধ্যয়ন করলে সঙ্গে সঙ্গে কোন একটা বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলেও এমন যোগ্যতা তার মধ্যে অবশ্যই সৃষ্টি হয়, যাতে নিজের পরিশ্রমে আগামীতে যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারে, লাভ করতে পারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি।

'গভীরভাবে' কথাটি এ জন্য বলেছি যে, শিক্ষাদানের বর্তমান ধারা একেবারেই অসম্পূর্ণ। মোল্লা নিযামুদ্দীনের দরসদানের নিয়ম ছিলো এই যে, তিনি বিশেষ কোন গ্রন্থের প্রতি তেমন গুরুত্ব দিতেন না। তিনি গ্রন্থকে মনে করতেন শিক্ষার অবলম্বন মাত্র। একে অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে তিনি মূল বিষয়ের শিক্ষা দিতেন। তার এ ধারায় শিক্ষা দানের ফলে সৃষ্টি হয়েছেন মোল্লা কামালুদ্দীন, বাহরুল উলুম এবং মোল্লা হামদুল্লাহর মতো যুগ স্রষ্টা 'আলিম।

পঞ্চম পর্যায়

এ পর্যায়টা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পতনের যুগ। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের বাতি তখন ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে চলেছিল। মুসলমানদের জ্ঞান ও শিক্ষার আসর অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার শিকার। এ পর্যায়ে যে পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়েছে, মুলতঃ তা'বিগত দরসে নিযামীর বিকৃত–পরিবর্তিত রূপ। তারপরও এখন পর্যন্ত এ পাঠ্যসূচীই প্রায় সকল মাদ্‌রাসায় প্রচলিত আছে। এ পাঠ্যসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয় এবং কিতাবগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইলমুস সরফ ঃ মীযান, মুনশায়েব, পাঞ্জগাঞ্জ, যুবদা, দস্তুরুল মুবতাদী, ছরফে মীর, বিগত অর্ধ শতাব্দী থেকে ইলমুস সীগাহ, ফুসূলে আকবরী এবং শাফিয়া, ইলমুল নাহু ঃ নাহুমীর, মিয়াতে আমিল, শরহে মিয়াতে আমিল, হিদায়াতুল নাহু, কাফিয়া ও শরহে জামী। ইলমুল বালাগাত ঃ মুখতাসারুল মা'আনী (সম্পূর্ণ) মুতাওয়াল ঃ 'মা আনা কুলতু' পর্যন্ত।'

ইলমুল আদব ('আরবী সাহিত্য) ঃ নাফ্‌হাতুল ইয়ামান, সাব'আ মুআল্লাক, দীওয়ানে মুতানাব্বী, দীওয়ানে হামাসা, মাকামাতে হারীরী।

ইলমুল ফিক্‌হ ঃ শরহে বেকায়াহ (প্রথমার্ধ) ও হেদায়া (দ্বিতীয়ার্ধ) ইলমু উসুলিল ফিক্‌হ ঃ নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ তালবীহ এবং মুসাল্লামুছ সুবুত উসূলে ফিক্‌হ-এর কিতাব হলেও যে অংশটি পাঠ্যভুক্ত মূলতঃ তা কালাম বিদ্যার অংশ। ইলমুল মানতিক (তর্কবিদ্যা) ঃ ছোগরা, কোবরা, ইসাগুজী কালা-আকুলু, মীযানুল মানতিক, তাহযীব, শরহে তাহযীব, কুৎবী, মীর কুতবী, মোল্লা হাসান, মোল্লা হামদুল্লাহ, কাযী মুবারক,

মীর যাহেদ, গোলাম ইয়াহইয়ার টীকাসহ, মোল্লা জালাল। কোথাও কোথাও বাহ্রুল উলূম শরহে সুল্লাম, মীর যাহেদ (আ'ব্দুল আলীর টীকাসহ) এবং সুল্লামের শরাহ্ মোল্লা মুবীন। ইলমুল হিকমত ঃ ও পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। মায়বুযী, সদরা, শামসে বাযেগাহ।

ইলমুল কালাম (আকায়িদ) ঃ শরহে আকায়িদে নাসাফী, খেয়ালী এবং মীর যাহেদ উসূরে আম্মা। রিয়াযী (গণিত) ঃ তাহ্রীরে উকালদাম, (ইউক্লিডের জ্যামিতি) (মাকালায়ে উলা) খুলাসাতুল হিসাব, তাস্রীহ্ শরহে তাশ্রীহ্, শরহে অচীগমিনী ফারায়েয (উত্তরাধিকার আইন) ঃ শরীফিয়া ইলমুল মুনাযারাহ্ (তর্কবিদ্যা) ঃ মুনাযারা-ই-রাশীদিয়াহ এটি ইলমুৎ তাফ্সীর ঃ জালালাইন, বায়যাবী (অংশবিশেষ) উসুলুল হাদীস ঃ শরহে নুখবাতুল ফিকার।

ইলমুল হাদীস ঃ বুখারী, মুসলিম, মুওয়াত্তা, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা। স্মর্তব্য যে, এ পাঠ্যসূচীতে মানতিকের যত কিতাব রয়েছে, সাধারণত একটি মাদ্রাসায়ই তা পড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু আরবী সাহিত্য ও হাদীসের যত কিতাব আছে, তা সব মাদ্রাসায় পড়ানো হয় না। আরবী সাহিত্যের কিতাব পড়তে কারো আগ্রহ হলে তাকে ক্লাসে না, বাড়তি সময়ে তা পড়তে হবে অবশ্য যদি ভাগ্যচক্রে কোন শিক্ষক জুটে, কেননা মাদ্রাসায় সাধারণত এমন উস্তাদ বিরল। হাদীসের জন্য অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকের পাঠ সমাপ্তির পর যেতে হবে এমন স্থানে, যেখানে হাদীস পড়ানোর মত উস্তাদ পাওয়া যায়। এ কারণে আমার মতে, হাদীস এবং আরবী সাহিত্যের কিতাবগুলোকে পাঠ্যসূচী বহির্ভূতই মনে করতে হবে।

শেষ পর্যায়ের এ পাঠ্যসূচীর ত্রুটি বিচ্যুতি

এক ঃ এতে মানতিকের কিতাব প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে গেছে। শুরু থেকে হিসাব করলে দেখা যাবে, একই বিষয়ে পনেরটা কিতাব রাখা হয়েছে।

দুই ঃ মানতিকের কিতাবগুলোতে মানতিকের বিষয় খুবই কম। মূলতঃ এগুলোতে দর্শনই আলোচিত হয়েছে বেশি। অপ্রয়োজনীয় এসব বিষয়ের গোলক ধাঁধয়ায় পড়ে ছাত্ররা মুল বিষয়ের প্রতি খুব বেশি একটা মনোযোগী হতে পারে না।

তিন ঃ মানতিক বিষয়ে পনেরটি কিতাব থাকলেও তাফসীরের মতো জরুরী বিষয়ে রাখা হয়েছে মাত্র দু'টি কিতাব–জালালাইন ও বায়যাবী। বায়যাবীর মাত্র আড়াই পাড়া পাঠ্যভুক্ত। জালালাইন সম্পূর্ণটা অন্তর্ভুক্ত হলেও তা এত সংক্ষিপ্ত যে, কুরআন শরীফ এবং এর শব্দ সংখ্যা প্রায় সমান সমান।

চার ঃ আদব ও আরবী জ্ঞানে পারদর্শিতার দ্বারা হাদীস–তফসীর বুঝা সহজ হয়। কিন্তু এর অংশ খুবই সামান্য। বালাগত তথ্য আরবী অলংকার শাস্ত্রের মাত্র দু'টি

কিতাব অন্তর্ভুক্ত মুখতাসার ও মুতাওয়াল। মুতাওয়াল সামান্য অংশ পাঠ্যভুক্ত, মুখতাসারও সম্পূর্ণ পড়ানো হয় না। আদব তথা আরবী সাহিত্যের অবস্থাও তথৈবচ!

পাঁচ ঃ এতে, ইতিহাস, ভূগোল, ইলমে 'এ' যাজুল কুরআনের মতো জরুরী বিষয় আদৌ অন্তর্ভুক্ত নেই।

পুস্তক বিন্যাস ও শিক্ষার পদ্ধতি

প্রচলিত ইতিহাস পুস্তকসমূহে শিক্ষার ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু পাওয়া গেল না। অবশ্য, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহ্‌লভীর ফার্সী ভাষার ওসিয়ত নামা'য় এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ পাওয়া গেল। এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তিনি এ পদ্ধতিকে বেশ ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর মনে করেন। এখানে তা হুবহু উল্লেখ করছি ঃ

طریق تعلیم علم چنانکه به تجربه محقق شدآن ست که نخست رسائل مختصره صرف و نحو درس گویند، سه سه نسخه ازهریکے یا چهار چهار بقدر ذهن طالب، بعد ازان کتابے از تاریخ یاحکمت عملی که بزبان عربی باشد آموزند، و بران میان برطریق تتبع کتب لغت و برآوردن مشکل از جائے آں مطلع سازند، چوں قدرت بزبان عربی یافت موطا بروایت یحی بن یحی مصمودی بخواناتند، وهر گز آں را معطل نه گذارند که اهل علم حدیث است، بعد ازاں قرآن عظیم درس گویند باں صفت که صرف قرآن نواند بغیر تفسیر و ترجمه گوید، وانچه مشکل باشد در نحو یادرسان نزول متوقف شود و بحث نماید - بعد فرانم از درس، تفسیر جلالین را بقدر درس بخواند درین طریق فیضها ست - بعدازاں در یك وقت کتب حدیث بخواند مانند صحیحین وغیرآنها و کتب فقهیه و عقائد و سلوك و دریك وقت کتب دانشمندی مثل شرح ملا جامی وقطبی وغیرآں ای ماشاه الله وگرمیسرآید مشکوة را یك روز نحواند و دیگر شرح طیبی بقدرانچه روز اول خوانده است بخواند نافع است-

অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষা দানের ধারা হচ্ছে এই যে, প্রথমে 'আরবী ব্যাকরণের শব্দ প্রকরণ ও বাক্য প্রকরণের ছোট বই পড়তে হবে। ছাত্রের

মেধা অনুপাতে তিন তিনটি বা চার চারটি বই পড়ানো যেতে পারে। এরপর ইতিহাস বা বাস্তব বিজ্ঞানের বই পড়াবে 'আরবীতে। এসময় অভিধান থেকে কঠিন কঠিন শব্দসমূহ খুঁজে বের করতে শিখাবে। 'আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জিত হলে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া মাস্‌মূদীর বর্ণনায় মুয়াত্তা পড়াবে। এটা কিছুতেই ছাড়বে না। কারণ, আসল ইলম হচ্ছে হাদীস-এর পাঠে ফয়য় আছে! আমার এসব কিতাবের সেমা আছে। এরপর কুরআন মজীদ শিক্ষা দিবে এমনভাবে যে, শুধু কুরআন শরীফ পড়বে তফসীর ছাড়া এবং তার তরজমা করবে। যেখানে ব্যাকরণের বা শানে নুযুলের দিক থেকে কোন অসুবিধা দেখা দেয়, সেখানেই থেমে আলোচনা করে নেবে। অতঃপর এক এক পাঠ করে তফসীরে জালালাইন পড়বে। এতে অনেক ফয়েয আছে। এরপর এক সময়ে একই সঙ্গে হাদীসের কিতাবগুলো পড়বে। যেমন সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ইত্যাদি। এ সময়ে ফিকহ্, 'আকাইদ ও সুলূকের কিতাব পড়বে। একই সময়ে অনেক ফয়েয আছে। একই সময়ে প্রজ্ঞা বুদ্ধিমত্তার গ্রন্থাবলী যেমন শরহে মোল্লাজামী, কুত্‌বী ইত্যাদি পড়বে যতদূর সম্ভব হয়। সম্ভব হলে একদিন মিশকাত এবং একদিন শরহে তীবী সমান অনুপাতে পড়বে। এভাবে পড়লে অনেক উপকার সাধিত হবে।

শ্রেণী বিন্যাস

শ্রেণী বিন্যাসের যে রীতি বর্তমানে প্রচলিত আছে ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, আগেরকালে মাদ্‌রাসাগুলোতে এ রীতি চালু ছিল না। অবশ্য এটুকু দেখা যায় যে, পাঠ্যভুক্ত কিতাবগুলো প্রধানত ঃ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। ১. মুখতাসারাত (مختصرات) ২. মুতাওয়াস্‌সিতাত (متوسطات) এবং ৩. মুতাওয়ালাত (مطولات)। মিযান থেকে শুরু করে কুৎবী পর্যন্ত মুখতাসারাত, সুল্লামুল উলূম ও অন্যান্য শরহ পর্যন্ত মুতাওয়াস্‌সিতাত এবং সদরা, শামসে বাযেগাহ ও বায়যাবী ইত্যাদি ছিলো মুতাওয়ালাত শিক্ষার্থীদেরকে কোন পর্যায়ের তা নির্ণয়ের মাপকাঠিও ছিল এ কিতাবগুলোই। সুস্পষ্টভাবে জানা না গেলেও সম্ভবত নিম্নস্তরের কিতাবগুলো অধ্যয়ন শেষে স্বাভাবিকভাবে তারা উচ্চতর স্তরের কিতাবাদি পাঠের বা সে গুলোর ক্লাসে শরীক হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো।

ছাত্রদের জন্য উপাধি

পঠিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেই সে অনুপাতে ছাত্রদের জন্য তিনটি উপাধি ছিলো ঃ ফাযিল (فاضل) আলিম (عالم) এবং কাবিল (قابل)। এসব উপাধি দিয়ে বার্ষিক জলসায় তাদেরকে সনদ দেয়া হতো।

১. মানতিক হিক্‌মতে ব্যুৎপতিসম্পন্ন কিন্তু দীনিয়াতে সামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছাত্ররা ফাযিল (فاضل) ২. দীনিয়াতে সিদ্ধহস্তদেরকে আলিম (عالم) ৩. আরবী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছাত্রদেরকে কাবিল (قابل) লকব দেয়া হতো।

জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র

আগে বিভিন্ন বিষয় এবং জ্ঞানের জন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিলো। ছাত্ররা নানা স্থান সফর করে যে বিষয়ের জন্য যে স্থান মশহুর, সেখানে গমন করে সে বিষয়ের ইল্‌ম হাসিল করতো। যেমন ঃ

ছরফ ও নাহু ঃ পাঞ্জাব।
হাদীস-তফসীর ঃ দিল্লী।
মানতিক হিক্‌মত ঃ রামপুর।
ফিক্‌হ, উসূল ও কালাম ঃ লক্ষ্ণৌ।

ফার্সী ভাষা ও বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদান

বিগত অধ্যায়ে যা আলোচনা করা হয়েছে, তা ছিলো 'আরবী ভাষার সাথে সম্পৃক্ত। বলা চলে, এটা ছিল অনেকটা কলেজের শিক্ষার মতো। মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক পর্যায়ে বা স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম ছিলো ফার্সী ভাষা। কারণ, ফার্সী ছিলো শাসক শ্রেণীর মাতৃভাষা। তাই প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হতো ফার্সীতে। কাজ–কারবারের ভাষাও ছিলো ফার্সী। এর ফলে এদেশের মক্তব-মাদ্‌রাসা এমন কি স্কুল কলেজে আজ পর্যন্ত ফার্সী ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়। আজ থেকে ৫০ বছর আগে পর্যন্ত [স্মর্তব্য, নিবন্ধটি রচিত হয়, ১৯১৯ সালে] এদেশের সাধারণ চিঠি-পত্র এমন কি পারিবারিক পর্যায়েও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শিক্ষিত লোকেরা ফার্সী ভাষা ব্যবহার করতেন।

এদেশে ফার্সী ভাষা চর্চার পরিণতি কি দাঁড়িয়েছে, এখানে তাও আলোচনা করা দরকার। ফার্সী ভাষায় পদ্য ও গদ্য রচনায় এ দেশে অনেকেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। আমরা এখানে মাত্র দু'চারজনের উল্লেখ করবো। ফার্সী ভাষীরাও যাঁদেরকে শুধু স্বীকৃতিই দেননি বরং তাঁদের অনুকরণকে গর্ব ও গৌরবের ব্যাপার বলে গণ্য করেছেন। মাসউদ সা'দ সালমান, আমীর খসরু, হাসান দেহলভী, ফয়যী এবং গালিবের জন্য গোটা উপ-মহাদেশ সঙ্গতভাবেই গর্ব করতে পারে। সা'দ, সালমান হলেন গযনভী শাসনামলের সবচেয়ে বড় কবি। ইরান ও ভারতবর্ষে সমভাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। আমীর খসরু ছিলেন আরও বড়। 'আল্লামা শিবলী নূমানী তাঁর শে'রুল আযম' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"হিন্দুস্তানে বিগত ছয় শ' বছরে এত বড় গুণসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম হয়নি। সত্য বলতে কি, ইরান এবং রোমও এত রকমারি গুণের অধিকারী হাজার বছরে দু'চারজন

মাত্র জন্ম দিয়ে থাকবে। একমাত্র কবিতা রচনার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে নিশ্চিত হতে হয় তাঁর ব্যাপকতায়। ফেরদাউসী, সা'দী, আন্‌ওয়ারী, হাফিয, উরফী এবং নযীরী–সন্দেহ নেই যে, এঁরা বড় কবি। কিন্তু এঁদের কাব্য প্রতিভা এক একটি শাখায় সীমাবদ্ধ। ফেরদাউসী মসনবী' থেকে সামনে অগ্রসর হতে পারেননি। সা'দী তো কাসীদা স্পর্শই করতে পারেননি। আনওয়ারী ছুঁতে পারেননি মসনভী ও গযল। হাফিয, উরফী ও নযীরী গযলের পরিমণ্ডলের বাইরে যেতে পারেননি। কিন্তু খসরুর রাজ্যে গযল, মসনভী, কাসীদা এবং রুবাই, সবই এক সমান। কথা সাহিত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিকের তো কথাই নেই। মওলানা জামী বাহারিস্তানে লিখেন যে, নিযামীর 'খামসার' জবাব আমরি খসরুর চেয়ে উত্তম কেউ দিতে পারেনি। আমীর খসরুর খেতাব ছিলো তুতিয়ে হিন্দ্। খাজা হাফিয এবং উরফীও তাঁকে এ খেতাবেই স্মরণ করেন। খাজা হাফিয বলেন ঃ

شکر شکن شـوند همـه طوطیـان هند – زیں قند پارس کـه بـه

بنگالـه مـیـروند – بـه روح خـسـر وازیـن پارسی شکر دادم – کـه کام

طوطئ هندوستان شرد شیـریـن

পারস্যের এ মিছরী বাংলায় গেলে সকল তুতিয়ে হিন্দ ম্লান হয়ে য়াবে। উরফী বলেন ঃ

এ পারস্য থেকে খসরুর রূহে মিছরি দিয়েছি যাতে তুতিয়ে হিন্দের কণ্ঠ সুমধুর হয়।

জীবনের শুরু থেকেই আমীর খসরুর মধ্যে ব্যাপক যোগ্যতা–প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বয়স যখন ৩১-৩২ বছর, যখন তাঁর তরকীর শুরু মাত্র তখনই তাঁর কবিতা দেখে শেখ সা'দী বলেছিলেন ঃ খসরু তো এক যোগ্য রত্ন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এবং তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন রয়েছে।

ফার্সী কবি হাসান ছিলেন কবি আমীর খস্‌রুর সমসাময়িক এবং তাঁর বন্ধু। ফার্সী ভাষায় গযল রচনায় তাঁর বিশেষ অবস্থান রয়েছে, তাঁর কবিতায় যে সারল্য স্বাচ্ছন্দ দ্রুততা, স্বচ্ছতা, ভাব প্রকাশের যে স্বাভাবিক গতি এবং অলংকরণ দেখা যায়, গযল রচনায় অগ্রগামীরূপে তা প্রথম ধাপ। কিন্তু এসব কিছুর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই উচ্ছাস তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়, আমীর খসরুর কবিতায়ও তা অনুপস্থিত। নীচের কয়েকটি কবিতা থেকে তা আঁচ করা যাবে ঃ

خلق گویند دل از صبر بجا آور باز

اے دل از صبر نشانے ده اگر جائے هست

اے کہ نظارہ دیوانہ نکردی ہرگز

قدمے رنجہ کن ایں سوئے کہ رسوائے ہست

بر چوں توکسے دگر گزیدن

کارے دگر است کارین نیست

گفتی کہ چراجدائی از من

ایں از فلك است از من نیست

باز ایں دلم بسوے دلارام یرود

از دام جستہ باز سوئے دام یرود

طرفہ سروکار یست کہ با وعدہ معشوق صابر نتواں بود وتقاضا

نتواں کرد از حسن این چہ سوال ست کہ معشوق توکیست ایں

سخن راچہ جواب ست تو ہم میدانی

گفتی کہ چراحال دل خویش نہ گوئ

من خود کنم آغاز بہ پایاں کہ رساند

(شحر العجم) ملخصا

–মানুষ বলে , ধৈর্য ধর, বিরত হও,
হে হৃদয় ধৈর্যের চিহ্ন দাও, যদি থাকে স্থান।
হে তুমি, কখনো দেখনি প্রেমের
দেওয়াল এযে পড়ো, দেখ এদিকে এক পাগল আছে।
তোমার মতো কাউকে দংশন করা,
এ যে অপরের কাজ, এ আমার কাজ নয়।
তুমি বললে, কেন বিচ্ছেদ আমার থেকে,
এ সে উপর ওয়ালার কাজ, হাসানের নয়।
পরে আমার এ হৃদয় ছুটে আয় আরাম পানে,
এক ফাঁদ থেকে ছুটে যায় অন্য ফাঁদের পানে।
কী অবাক কাণ্ড প্রেমিকের প্রতিশ্রুতি নিয়ে
ধৈর্য ধারণ সম্ভব নয়, তা দাবিও করেনা।
হাসানের কাছে এ কি জিজ্ঞাসা কে তোমার প্রেমাস্পদ ?

এ কথার জবাব কী, তা তো তুমি নিজেই জানো।
তুমি বললে, কেন তোমার নিজের মনের অবস্থা বল না ?
আমি নিজে করেছি শুরু , যাতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি।

ফয়য ছিলেন আকবরের দরবারের মালেকুশ শুআরা–কবিদের সম্রাট 'সেখানে আরো অনেক ফার্সীভাষী (ইরানী) কবি বর্তমান ছিলেন। বাহ্য সৌন্দর্য ছাড়াও আভ্যন্তরীণ দিক থেকেও তাঁর কবিতায় যতসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও এটুকু না বলে পারা যায় না যে, অনবদ্যতায় তাঁকে সমস্ত কবিদের চেয়ে, এতটা অগ্রসর মনে হয় যে এটা কেবল তারই বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। সন্দেহ নেই যে. ভাব প্রকাশের উচ্ছাস খাজা হাফিযের মধ্যেও বর্তমান রয়েছে, এবং তা অতি উচ্চ পর্যায়েই রয়েছে। কিন্তু তা মদ্যপান বিষয়ক এবং দুনিয়ার বিশ্বমানবতার মাঝে সম্পৃক্ত। ফয়যীর কবিতায় আত্মগব প্রেমগাথা দর্শন তত্ত্ব বিষয়, এসব বিষয়ে সমান জোশ-আর আবেগ দেখা যায়। তার অপরাপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রূপক ব্যবহার আর উপমার উৎস প্রাচুর্য। যদিও আকবরের যুগের কবিদের প্রায় সকলের মধ্যেই এগুণটি পাওয়া যায়। কিন্তু নাওয়ী সিরাজী এবং উরফী এগুণে সমস্ত সমকালীন কবিদের চেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডীত। আর ফয়যী তাদের মধ্যে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এহেন দক্ষতা আর শিক্ষাগুণের অনুকরণে গযল রচনা করে শেষ পংক্তিতে বলেন ঃ

ایں آں غزل که فیض شیریں کلام گفت

در دیده ام خلیده و در دل نشته

এতো হচ্ছে সে গযল, যা রচনা করেছেন মিষ্টিভাষী ফয়যী, যা আমার চক্ষুকে করেছে বিস্ফারিত অন্তরে নিয়েছে স্থান। রসথী কলন্দর ছিলেন একজন ইরানী কবি। তিনি স্বীয় প্রশংসা আর স্তুতিভাজন খানে খানানের প্রশংসায় ফয়যীর শ্রেষ্ঠত্ব আর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে

رفیض نام توفیضی گرفت چوں خسرو

به تیغ هندی اقلیم سبعه را بکسر

– তোমার নামের ফয়েয থেকে তুমি ফয়যী নাম ধারণ করেও হিন্দী তরবারী দ্বারা একবারে সপ্তমহাদেশ জয় করেছো। যেমন খসরু, ইরানের প্রসিদ্ধ কবি আলী নকী কামরাহ ফয়যীর প্রশংসায় কাসীদা রচনা করে ইরান থেকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেন ঃ

مرا افگند بر نظم امورم پر توفیضی ابو الفیض آں کریں اکبر
و شیخ کبیر من اگر هستم مجیر اندر سخن او هست خاقانی و گر
من مستجیر آستان او مجیر من کیم با اور سر دوشاعری دعوت هم
چشمی که دریں خانقا هم من مریدواوست پیر من
(شعر العجم) ملخصا

আমার বিষয় আমাকে কাব্যে এনেছে কিন্তু তুমি ফয়যী।
ফয়েযের বাবা, তেমনিভাবে মহান আর আমার মহান উস্তাদ।
আমি যদি হই মুজীর, কবিতায় তিনি হচ্ছেন খাকানী, আমি যদি হই মুস্তাজীর, তবে তার আস্তানা আমার মুজীর।
কিয়াম-এর সঙ্গে পৌঁছে কবিতায় মুখোমুখির দাবী।
কারণ, এ খানকায় আমি মুরীদ আর তিনি আমার পীর।

সবশেষে নাম নিতে হয় 'খাতিমুল আমাতিযা মির্যা গালিবের, যাঁর মুজিযাসুলভ বিশলক্ষ সুষমা ফার্সী কবিতার মৃতদেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করেছে। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একই সময়ে ইরান এবং হিন্দুস্তান উভয় দেশে গালিব এবং কাসানী ফার্সী কবিতার সংস্কার সংশোধন আর উন্নতি বিধানে নিয়োজিত ছিলেন। এ দু'জনের মধ্যে যে কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তা বলা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন পরিণতির বিষয়ে এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দেয়া। আমরা সাধারণভাবে কেবল এতটুকু বলতে পারি যে, কাসানী পাঠ করে যদি ফররুখী এবং মনুবেহরী বলে ভ্রম হয় এতে গালিবের কবিতা ইসমাঈল কামাল এবং সালমান সাউজীর নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। মির্যা গালিবের প্রথম দিকের কবিতা নিতান্ত চটুল হলেও তা ত্রুটিমুক্ত নয়, তিনি যতদিন মির্যা বে-দেল এবং জহুরীর পথে চলার চেষ্টা চালিয়েছেন, ততদিন তিনি ভ্রান্তিতে পতিত ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি যে ধারায় কবিতা রচনা করেছেন, নিঃসন্দেহে তা উস্তাদসুলভ ধারা। এতে সর্বত্র তাঁর যোগ্যতা আর দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তাঁর একটা কাসীদা, যার শেষ পংক্তি এ রকম ঃ

دواست شور نشنید وترانه مستان را
بشرط آنکه نه گویند راز پنهاں را

—মাস্তানদের জন্য হৈ চৈ আর গান শোনা বৈধ,
এ শর্তে যে, প্রচ্ছন্ন রহস্য ফাঁস করবে না।
কত পরিপক্কতা, সরলতা, স্বচ্ছতা আর উস্তাদসুলভ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

মির্যা গালিব এ কাসীদার শেষে কবিসুলভ গর্ব আর দাবী নিয়ে নিজেই স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ঃ

چناں نگاشته ام ایں ورق که گرنگره

فتد زدست قلم نقشبند شروان را

(خاقانی)

گزیده ام دوش خاص کاندریں هنجار

به پویه پائے بلرزر و ظهیر و سلمان را

এমনভাবে লিখেছি এ পাতাগুলো যে, তা না করলে পড়ে যেত
হাত থেকে কলম, ঢাকনাবন্দ শেরওয়ান পরে
অবলম্বন করেছি আমি বিশেষ ধারা এ পথে,
যা যহীর আর মুসলমানের পায়েও কম্পন ধরায়।

ফার্সী গদ্য সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমীর খসরুর ইজাযে খসরুভীর' (اعجاز خسروی) নাম উল্লেখ করতে হয়। এ গ্রন্থে ফার্সী গদ্য রচনার রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সম্ভবত ঃ এটি প্রথম রচনা। এটা অতি প্রাচীন কালের রচনা। তাই প্রাচীনকালের সব বৈশিষ্ট্যই এতে বর্তমান রয়েছে। বিষয়বস্তু এবং রচনা শৈলীর গুরুত্ব বিচারে এরপরই নাম নিতে হয় আবুল ফযলের 'আইন-ই- আকবরী' ইত্যাদি রচনার। আবুল ফযলের রচনা প্রাচীন রচনা রীতি থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও তা একেবারেই জটিলতামুক্ত নয়। অবশ্য ঠিক একই সময়ে আবুল ফযলের ভাই আবুল ফয়েয ফয়যী সাদামাটা রচনার রীতি প্রবর্তন করেন। ইনশায়ে ফয়যী' আবুল ফযলের চিঠিপত্রের সংকলন। তখন পর্যন্ত মুন্সীয়ানা যাহির করাই ছিলো চিঠি পত্রের লক্ষ্য। ফয়যী এ রীতি পরিবর্তন করে সাদামাটা কথায় মূল বক্তব্য উপস্থাপনের রীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর চিঠিপত্র থেকে সেকালের তাহযীব–তমদ্দুন এবং সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এরপরই আমাদেরকে নাম নিতে হয় "তুয্‌কে জাহাঙ্গীরীর"। সবদিক বিচারে এটিকেই সে সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিহিত করতে হয়। এতে সাদামাটা ভাষায় মূল বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মাধুর্যও বজায় রাঁখা রয়েছে। ফার্সী রচনা রীতিতে এটা এক অনুপম গ্রন্থ। সাদামাটা ভাষায় মূল বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সম্রাট আলমগীরের 'রুক্‌'আত' বা পত্রাবলীও এর চেয়ে কম নয়, বরং কোন ক্ষেত্রে উন্নতও হতে পারে। তারপরও

ভাষার মাধুর্য এবং রচনা রীতি অনুসরণের দিক থেকে আলমগীর কোথাও কোথাও হোঁচট খেয়েছেন, কিন্তু জাহাঙ্গীরের কলম ভুলেও কোথাও হোঁচট পর্যন্ত খায়নি। ভাষার মাধুর্য আর রকমারি ভঙ্গিতে মূল বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে তুযুকে জাহাঙ্গীরীর সাথে রুক'আতে আলমগীরীর কোন তুলনা হয় না, হতে পারে না। কারণ, শুষ্ক রসকষহীণ বর্ণনা আর বর্ণাঢ্য বর্ণনা–ভঙ্গি কখনো এক হতে পারে না। এরপরও হিন্দুস্থানী রচনা রীতির এদুটি হচ্ছে বিশিষ্ট রচনা। হাজরো যহুরী, ওয়াকায়ে নি'মত খান আলী এবং 'মুন্শিয়াতে মোল্লা তাহির ওহীদকে এ জন্য উৎসর্গ করা যেতে পারে।

এগুলো ছাড়াও এদেশে ফার্সী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকতে পারে যেগুলোতে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের উৎকৃষ্ট স্বাক্ষরও বর্তমান রয়েছে। কিন্তু সেসব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়। ফার্সী সাহিত্য ও গদ্য রচনা এখানে আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। উপমহাদেশের ফার্সীভাষী মুসলমানদের সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। বলা চলে, ফার্সী ছিলো এদের মাতৃভাষা। মুসলিম শাসন ও তমদ্দুনের অধীনে এসে এদেশে হিন্দু সম্প্রদায় ফার্সী ভাষায় যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে, এখানে সে সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কিন্তু দুঃখিত, সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই। তাই আলোচনা করা হবে অতি সংক্ষেপে, বরং বলা চলে অনেকটা আকার–ইঙ্গিতে।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত হিন্দুরা ফার্সী ভাষা থেকে অনেক দূরে ছিল। তখন ফার্সীর সাথে তাদের কোন পরিচয়ই ছিলো না। কিন্তু হিজরী দশম শতকের শুরুতে অর্থাৎ সিকান্দার লোদীর শাসনামলে তারাও ফার্সী ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং শেষ পর্যন্ত এমন সফল ভাবে এ ভাষা রপ্ত করে যে, তারাও এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমকক্ষ হয়ে উঠে। ফার্সী ভাষার সকল বিভাগে তারা সমান দক্ষতা অর্জন করে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় লেখক, কবি, সাহিত্যিক। এখানে তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

ইতিহাস বিদ্যায় লুব্বুত তাওয়ারীখ, তারীখে শাহানে হিন্দ, রাজাবলী, হালাতে মারহাট্টা, খুলাসাতুল হিন্দ, ফুতুহাতে আলমগীরী, তারীখে দিলকুশা, তারীখে কাশ্মীর, তারীখে আসিফী, গোয়ালিয়রনামা, তারীখে সুরাত, খুলাসাতুত তারীখ, তারীখে ফরমারাওয়াঁনে হনূদ—তুহফাতুল হিন্দু, নাযারাতুস সিন্দ, ওয়ারিদাতে কাসেমী, মাখযানুল ইরফান, সুলতানুত তাওয়ারীখ, চাহার গুলশান এবং কিসতাস ইত্যাদি হচ্ছে ফার্সী ভাষায় হিন্দু লেখকদের রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থটি নানাবিধ জ্ঞানের বিস্তৃত ইতিহাস। গ্রন্থকার এ গ্রন্থটিকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে হিন্দু

দর্শন, দ্বিতীয় ভাগে গ্রীক দর্শন, তৃতীয় ভাগে 'আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং চতুর্থ ভাগে ইউরোপে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কিত আলোচনা দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, একজন হিন্দু লেখক কিভাবে এত বিস্তৃত আলোচনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

তায্‌কিরা বা জীবনীমূলক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সাঈদনামা, তাযকিরাতুল উমারা সাফীনা-ই-ইশরাত, হালাতে নানক শাহ্‌, শামে গারীবা, সফীনা-ই- খুশগাওয়ার, হাদীকা-ই হিন্দী, আমীরনামা সাফীনা-ই-হিন্দু, হালাতে বাবালাল গুরু গুলে রা'না এবং হামেশা বাহার ইত্যাদি হিন্দু লেখকদের রচিত ফার্সী গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থটি এতই নির্ভরযোগ্য যে, আল্লামা বিলগিরামী তাঁর রচিত খাযানায়ে আমেরা গ্রন্থ রচনাকালে এটিকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ফার্সী ভাষায় রচিত অভিধানের মধ্যে গুরুধারী লাল-এর গাঞ্জে লুগাত পণ্ডিত গঙ্গা ভূষণ-এর শীর ও শকর, শিয়ালকোটের মিল ওয়ারেস্তার 'মুসতালাহাতুশ্‌ শুআরা এবং চেকবান্দ বাহার-এর 'বাহারে আযম' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ফার্সী ব্যাকরণ ও রচনায় 'নাওয়াদিরুল মাসাদির, 'বাহারে উলূম এবং 'হাফতগুল ইত্যাদি হচ্ছে হিন্দুদের রচিত গ্রন্থ।

হিন্দুস্তানের ফার্সী কবিদের সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই। নির্বাচিত কয়েক জন হিন্দু কবির কবিতা উদ্ধৃত না করেও পারা যায় না। এসব কাব্যাংশ থেকে ফার্সী ভাষায় তাঁদের বুৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে। ফার্সী ভাষায় মুসলমান কবিদের মধ্যে গুটিকতক ব্যতিক্রম বাদে এসব হিন্দু কবির কবিতা কি কোন অংশে নিম্নমানের ?

মুনশী ঈশ্বরীদাস 'আরাম' নিযামুলমুলক আসিফ জাহ্‌-এর প্রশংসায় লিখেন ঃ

بفرکوکبه بخشی ممالك هند – سرد که باج ذخوارزم وزختن گیرد
شهان زصولت آں جم وتار امن جاه – رکاب تو سن شاهنشاه زمن
گیرد جواں وصاحب بخت جواں نظام الملك – که یاد همت ازو مردم
دکن گیرند برید گردن بلوئے فتنه ساز نخست – چنانکه مبح سر
شمع در لگن گیرند

আনীম আবাদের কায়স্থ পরিবারের লালা উজাগর উলফতী লিখেন ঃ

درآمد شام غم در سینه حسرت نام مهمانے – زداغ دل کشیدم بے
تکلف پیش او خوانے

অযোধ্যার রাজা উলফত রায় উলফত লিখেন ঃ

نیست اهل آسماں را بردرت بے اذن بار -

می کند گردوں طواف در گهت لیل و نهار

هرچه ناممکن بود اید زتوبر روئے کار -

از غبار در گه عرش احتر امت آشکار

মসনবীয়ে নায়রাঙ্গে তাকদীর-এর খ্যাতনামা কবি আযীম আবাদের কায়স্থ পরিবারর রাজা পেয়ারে লাল উলফতী লিখেন ঃ

چوں غنچه جز سکون نباشد بیان ما

پپچیده شد زبان سکن دردهان ما

اندیشه مآل نیاید زما درست

دردست دیگر ست چوں سود و زبان ما

دردشت پر بلائے جنون نینست الفتی

جز موج ریگ واشك روان کاروان ما

আমানত রাজা আমানত রাম লিখেন ঃ

شکر لله نقش پائے مه جبینے بافتم

ارزوئے سجده می کردم زمینے یافتم

লক্ষ্ণৌর কায়স্থ পরিবারের লাল চান্দ উনস লিখেন ঃ

روح جمشید بردر شك به مے نوشی ما

که لب یاد بود مایه بے هو شئ ما

جائے رحم ست خدا را نتواں کرد در دریغ

هبست وابسته تیغ تو سبمد وشئ ما

দারাশিকোর মীর মুনশী (মুখ্যসচিব) আগ্রার ব্রাহ্মণ পরিবারের চন্দ্রভান লিখেন ঃ

کنم زساده دلی بند دیده مر گال را

بمشت خس نتوان بست راه طوفان را

ব্রাহ্মণা পরিবারের গওহর লাল তাফতা

چند گ،ئی که نشان نیست زخونین کفنان

مگر این لا له که بینی زشهیدان تونیست

'তারীখে ফরমাঁ রাওয়াইয়ানে হুনূদ'-এর লেখক কায়স্ত পরিবারের রায় অমর সিং খোশ্‌দিল লিখেন

گرم است بسکه ناله آتشفشان ما

سوزد برنگ شمع زبان در دهان ما

লক্ষ্ণৌর লালা কালিকা প্রসাদ মুজেদ

رسائی نیست تاسر منزل او کفر و ایمان را

که دیر و کعبه سنگ ره بود گیر و مسلمان را

বুরহানপুরের মুনসী লালা ফতেহ চান্দ

نیست آسایش بمنزل جان از خود رفته را

هر قلم دام آست نقش پاشکار جسته را

بسکه از شرم تو در پر واز رنگ گلشن است

رشته نظاره بند در در هوا گلد سته را

সম্রাট আকবরের অন্যতম অমাত্য রায় মনোহর লাল–

روزیکه سموم حشر افزون گردد

در آتش غم چوچهره گلگود گردد

ما دردو زخ چنان بدوقے سوزم

کز رشك دل بهشتیاد خون گردد

উপরে যাঁদের কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে, এক দু' শতাব্দী আগে তাঁদের পূর্বপুরুষরা ফার্সী ভাষা জানা তো দূরের কথা, ঠিক মতো ফার্সী শব্দের উচ্চারণও করতে পারতো না। হিন্দুরা ফার্সী ভাষা শিখতে শুরু করে হিজরী দশম শতকের শুরুতে। হিজরী ত্রয়োদশ শতকের সূচনা বা বড় জোর মধ্যভাগ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে।

এখন প্রশ্ন জাগে, কি করে এটা সম্ভব হলো! এত স্বল্প সময়ে কি করে ফার্সী ভাষা বিস্তার লাভ করেছে। হিন্দুরা কি করে এত অল্প সময়ে ফার্সী ভাষায় এতটা ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে? এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব হলো ঃ

কোন ভাষা আয়ত্ত করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে সে ভাষার লোকদের সংস্পর্শ-সাহচর্য লাভ করা। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার এটাই হচ্ছে সহজ এবং উত্তম উপায়। কোন ভাষা আয়ত্ত করার জন্য সে ভাষার লোকদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলা এখনও তা সর্বোত্তম উপায় বলে স্বীকৃত।

এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় তখন এ সুযোগই লাভ করেছিল। তখন হিন্দুরা মুসলিম আমীর ও রইসদের দরবারে উঠা-বসা করতো, তাদের সাথে মেলা-মেশার সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করতো। তাদের প্রতি, মুসলমানদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং দারাশিকোর দরবারে হিন্দু মুসলমান সমভাবে শরীক থাকতো। এ কারণে এদেশে ফার্সী ভাষার ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। সকলেই ফার্সী ভাষার স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেছে। পরে ফার্সী ভাষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শিক্ষা পদ্ধতি

প্রথম দিকে হিন্দু শিশুদের ফার্সী হরফ পরিচয়, উচ্চারণ এবং লিখনে বেশ অসুবিধা হতো। হিন্দুরা আর্য বংশোদ্ভূত। আর আর্যদের ভাষা বাম থেকে ডানে লিখা হয়। কিন্তু ফার্সী ভাষা লিখতে গিয়ে তাদেরকে চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত ডান থেকে শুরু করে বাম দিকে লিখার অভ্যাস করতে হয়। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য বাদশাহ আকবর এ পন্থা ঠিক করে দেন যে, প্রথমে ওস্তাদ শিশুদেরকে অক্ষর শিক্ষা দিবেন। হরফ মশক করাবেন। এরপর হরকত (স্বরচিহ্ন) এবং যুক্ত অক্ষর শিক্ষা দিবেন। এভাবে ধীর ধীরে ছোট ছোট বাক্য কবিতা এবং দীর্ঘ ইবারত লিখন এবং পঠন শিক্ষা দেয়া হবে। আইনই-আকবরীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলা হয় ঃ

بفرمودة گیتی خداوند حروف ابتث (یعنی مفردات اب ت ث) برنو یسنه و دیگر پیکر را بد انسان نگارند - نخست بصورت ونام آشنا گرد نه و در روز بیش نه کشد که از نقوش پیو سته (یعنی مرکب) آگهی بر گیرد .... و کو شش رود که هریك را (نو آموز) خود بشناسد و اند کے استاد دستگیری کند -

আল্লাহর বাণী অনুযায়ী আলিফ-বা-তা-সা হরফ শিক্ষা দিবে। নানাবিধ আকার-আকৃতি শিখবে। প্রথমে ছবি এবং নামের সাথে পরিচয় করবে। এভাবে

দু'দিন কেটে যাওয়ার পর যুক্ত অক্ষর চিনতে পারবে। - - - - চেষ্টা করবে যাতে প্রত্যেকে নিজে নিজে চিনতে পারে। শিক্ষক সামান্য সহযোগিতা করবেন।[৭১]
এ শিক্ষা পদ্ধতির লাফল্য সম্পর্কে আবুল ফযলের সাক্ষ্য হচ্ছে ঃ

بدید روش انکه بسالها آموختے بماه بل بروز کشید وجهانی به شگفت در آمد .... وازیں طرز الهی مکتبها رونق دیگر گرفت و مدرسها فروغ تازه یافت –

–এধারায় এক বছরে শেখার বিষয় এক মাসে বরং এক দিনে শেখা হয়। উন্মোচিত হয় একটা নতুন জগৎ। - - -এ ধারায় মক্তবগুলো অপরূপ রওনক লাভ করে। মাদ্‌রাসাগুলো লাভ করে নব নব উৎকর্ষ।[৭২]
সে সময় কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা দেয়া হতো, সে সম্পর্কে আবুল ফযল লিখেন ঃ

اخلاق حساب سیاق ، ملاحت، مساحت ، هندسه، نجوم، رمل، تدبیر منزل، سیاست مدن، طب، منطق، طبیعی، ریاضی، الهی، تاریخ مرتبه مرتبه اندوزدواز هندی علوم بیاکرن نیائے بید انت یا تبخل بر خواند –

অংক, কৃষি, দূরত্বের মাপ, ভূমির মাপ, জ্যামিতি, জ্যোর্তিবিদ্যা, জ্যোতিষের গণনা, নীতিশাস্ত্র, গার্হস্থ্ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, তিব্ব (ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান), মানতিক, তবীয়ী, রিয়াযী ও ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে পড়ানো হতো। হিন্দীর ব্যাকরণ, বেদান্ত, পাতাঞ্জল বা যোগশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হতো।[৭৩]

ফার্সী পাঠ্যসূচী

আমি অনেক চেষ্টা করেও ফার্সীর প্রচলিত ইতিহাস পুস্তকসমূহে ফার্সী পাঠ্যসূচী সম্পর্কে কিছু খুঁজে পাইনি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন চরিত ও অন্যান্য সূত্র থেকে কেবল এটুকু জানতে পেরেছি ঃ
গদ্যে–

"নুসখা-ই- তালীমিয়্যা' তা'লীমে আযীযী, দসতুঁরুস সিব্‌ইয়ান, ইনশা-ই-মাধূরাম, ইনশা-ই-ফায়েক, ইনশাই খলীফা, রুকআত-ই-আলমগীরী, গুলিস্তা, আবুল ফযল, বাহার-ই-দানেশ, আনওয়ার সুহাইলী সে নস্‌রে যহুরী, ওয়াকায়ে নি'মত খান 'আলী।
এবং পদ্যে–

করীমা, মুকীমা, খালিক বারী বুস্তাঁ, ইউসুফ জুলায়খা, কাসায়েদে উরফী, কাসায়িদে বদর চাচ, দীওয়ান-ই-গনী, সিকান্দার নামা ইত্যাদি গ্রন্থগুলো সাধারণতঃ পড়ানো

হতো। আমি বিস্মিত হই যে, শাহ্‌নামা, দীওয়ান-ই-সায়েব, দীওয়ান-ই-হাফিয এবং খসরুর রচনাবলীর মতো উন্নত মানের গ্রন্থ কেন পড়ানো হতো না। এছাড়া ইতিহাসের মতো প্রয়োজনীয় বিষয় আদৌ পড়ানো হতো না। নীতি শাস্ত্রের কিতাবগুলো ছিলো নামকাওয়াস্তে। অনেক চিন্তা করেও মনকে কোনভাবেই শান্ত-তৃপ্ত করতে পারিনি। এ সময় বিহারে আল-ইসলাহ কুতুবখানা থেকে রুকআতে আলমগীরীর একটা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আসে সংশোধন পরিমার্জনের জন্য। সৌভাগ্যবশতঃ তার সাথে আরো একটা কিতাবও আসে। তার নাম 'খুলাসাতুল মাকাতীব রচনাকাল হিজরী ১১০০ সাল। কিতাবটি একজন হিন্দু লেখকের লেখা। তার নাম জানা যায়নি। তবে কিতাবের শুরুতে এর রচনার কারণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

از چند گاه فرزند ارشد ارجمند، نور چشم مراد فروغ دیده استعداد زیب باغ زندگانی، زینت چراغ کا مرانی، غرة شجرة آمال و امانی، بمار پیر ائے گلشن رضا جوئ، رونق افزائے چمن فرخنده خوئی مظهردانش و فرهنگ راے سنگه به تقاضائے طبع انشائے دوست استدعا می نمود که نسخه متضمن به منشاے که پسند طبع انشاء طالباں تو اند یود ترتیب باید داد .... ایں نسخه که مسمی به خلاصة المكاتيب است در سه چهل و در عالمگیری مطایق یکهزار و یکصدی هجری مرتب گردا ینده -

একজন হিন্দু লেখক ফার্সী ভাষায় কত উৎকৃষ ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনা করতে পারেন, উপরের উদ্ধৃতি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ এর অলংকার সংযোজনে প্রায় অসম্ভব বলা চলে। তাঁর রচনা থেকে জানা যায় যে, প্রাণপ্রিয় পুত্র এবং বন্ধু মহলের অনুরোধে ফার্সী ভাষা শিক্ষার্থীদের হৃদয়গ্রাহী এ গ্রন্থটি রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং নামকরণ করেছেন খুলাসাতুল মাকাতীব বা রচনাসার। বাদশাহ আলমগীরের সিংহাসন আরোহণের ৪২তম বর্ষ মুতাবিক হিজরী একাদশ শতকে এ গ্রন্থ রচিত হয়।

স্পষ্ট যে, নিছক মুনশিয়ানা প্রয়োজনে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। অর্থাৎ নানা বিষয়, বস্তু এবং দৃশ্যের বর্ণনা কিভাবে দেয়া যায়, তা দেখানোই এ গ্রন্থের লক্ষ্য। বিভিন্ন উপলক্ষ এবং মৌসুমের বর্ণনায় কোন কোন বিষয় বিশেষভাবে তুলে ধরতে হবে, তা দেখানোই-এর উদ্দেশ্য। আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্র দিয়ে গ্রন্থ শুরু করা হয়েছে। এতে ইবাদত, সৎ সংসর্গ, দম্ভ-অহংকার ত্যাগ, বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা, কার্পণ্যের

নিন্দা, অপব্যয় পরিহার-মজলিসের শিষ্টাচার ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর জ্ঞানের ও কারুকার্যের সংজ্ঞা, কাগজ লিখন পদ্ধতি ইত্যাদির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এরপর শিশুদের শিক্ষাদান এবং রচনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। অনাবৃষ্টি, অভাব ও মহার্ঘ্য, বর্ষা ও বসন্তকাল, বর্ষাঋতু, নওরোজের অনুষ্ঠান, শীত ঋতু, শীত ঋতুর সূচনা, হেমন্ত ঋতু, বসন্ত ঋতু, বসন্ত রবি শস্যাদি, নানাবিধ ফলফুল, প্রবহমান পানি, বাগান, শহর ইত্যাদি নানা বিষয়ে চমৎকার রচনা সবিস্তারে লিখা হয়েছে। শিশুদের শিক্ষাদান অধ্যায়ে লেখক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে ফার্সী পাঠ্য পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিশুদেরকে এ ধারায় বইগুলো পড়াতে হবে। যদিও এটা কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়, বিশেষভাবে প্রাচীন পাঠ্যসূচী আলোচনা করাও তাঁর লক্ষ্য নয়, তবুও তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারায় যে পর্যায়ক্রমে তিনি গ্রন্থগুলোর নামোল্লেখ করেছেন, তা থেকে এতটুকু প্রতীয়মান হয় যে, হিজরী একাদশ শতকে এসব গ্রন্থ পড়ানো হতো। সর্বত্র বাধ্যতামূলকভাবে হয়তো সব গ্রন্থ পড়ানো হতো না। তবে মোটামুটি এটুকু বলা যায় যে, তখনকার পাঠ্যসূচীতে এসব গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল। লেখক এ পর্যায়ে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন ঃ ১. সাহিত্য ও রচনা ২. পদ্য ও কবিতা ৩, গল্প ও কাহিনী ৪. ইতিহাস এবং ৫. নীতিশাস্ত্র এখানে লেখকের মুল বক্তব্য তুলে ধরলে পাতার পর পাতা ব্যয় করতে হয়। কেননা, প্রাচীন রচনা রীতিতে সামান্য বক্তব্য দীর্ঘ কয়েক ছত্রে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর ফলে অহেতুক রচনার কলেবর বেড়ে যায়। আমি এখানে তাঁর বক্তব্যের অংশ বিশেষ এবং ধারাবাহিকভাবে কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করবো। ছোট শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায় সম্পর্কে তিনি লিখেন ঃ

پس از اں بخواندن کتب متبرك عند ليب گلستان شير از، بلبل حقيقت ومجاز حضرت شيخ مصلح الدين انار لله برهانه كه به سعدی شير ازی مشعور است چراغ خرد را روغن اندازد پس ازين كتب پايه به پايه خواند - و خوانده را در وقت فرصت وايام تعطيل سر كندتا عبارات مشكله كه دريافت آں موقوف برتكرار است فرا موش نگردد-

–শীরীযের গুলবাগিচার বুলবুল শায়খ মুসলেহুদ্দীন সা'দীর বরকতময় কিতাবগুলো পড়ে জ্ঞানের বাতিতে তেল ঢালবে। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কিতাবগুলো পড়বে। অবসর সময়ে এবং ছুটির দিনে পঠিত বিষয় পুনঃ পুনঃ পাঠ করবে। এর ফলে পঠিত

অংশ ভুলবে না। বারবার পাঠ করার পরই কঠিন অংশ আয়ত্ব করা নির্ভর করে। এরপর লেখক ইন্‌শা বা রচনা শেখার জন্য নিম্নোক্ত বিতাবগুলো পাঠ করার পরামর্শ দেন ঃ

ইনশা-ই-ইউসুফী নামে পরিচিত বাদায়েউল ইনশা, আবুল ফযলের পত্রাবলী, শায়খ মুহাম্মদ সালেহ রচিত বাহার-ই-সুখুন, মোল্লা মুনীর এর পত্রাবলী, কারনামা-ই লাল চান্দ, মোল্লা জামী ও মোল্লা মুনীর-এর রচনাবলী (مرقومات ملا جامی و ملا منیرم) বাদশাহ শাহজাহানের সচিব শায়খ ইনায়েতুল্লাহ রচিত গুলদাস্তা, (گلدستة شیخ عنایت الله منشی شاهجان) রুকআতে-ই-আলমগীরী শায়্দা ও মোল্লা তোগরার রচনাবলী, শায়খ ফয়যী অনূদিত 'লীলাবতী' তিনি স্থানে স্থানে অনেক মূল্যবান উপদেশও দিয়েছেন। এরপর পদ্য ও কবিতা শিক্ষা সম্পর্কে লিখেন ঃ

جود طریقه خطوط نگاری بدست افتد برائے جلاء طبیعت پایه

بپایه کتب متعارفه که .... اند بر خواند -

–পত্র লেখার রীতি রপ্ত করার পর মনকে চাঙ্গা করার নিমিত্ত পরিচিত কিতাবগুলো পড়বে।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

ইউসূফ যোলায়খা, তুহফাতুল আহরার, মোল্লা জামীর 'নুসখাতুল আবরার, সিকান্দর নামা, মাখ্‌যানে আসরার, হাফ্‌ত পায়কার শিরী-খসরু, লায়লা মজনু, কিরানুস সা'দাইন, মাৎলাউল আনওয়ার, আমীর খসরু দেহলভীর ই'যাজে খুস্‌রুভী, দীওয়ান-ই- শাম্‌স্ তিবরীয, দীওয়ান-ই-যহীর ফারইয়াযী, দীওয়ান-ই-সা'দী, দীওয়ান-ই-হাফিয, কাসায়িদ-ই- আনওরী, কাসাযিদ-ই-খাকানী, কাসায়িদ-উরফী, দীওয়ান-ই-ফয়যী, দীওয়ান-ই-বদর চাচ, দীওয়ান-ই-সায়ের, গল্প ও কাহিনী প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

برائے عشرت اندوزی نسخه طوطی نامه بخشی وانوار سهیلی

تصنیف مولانا حسین واعظا کاشفی و عیار دانش شیخ ابو الفضل

وبحار دانش شیخ عنابت الله که هم عپارات غریب وهم حکایات

عجیب و فرح افزاے طبائع است بر خواند -

চিত্তবিনোদনের জন্য বখশীর তুতীনামা, মাওলানা হুসাইন ওয়ায়ে কাশেফী রচিত আনওয়ারে সুহাইলী, শায়খ আবুল ফযল রচিত বাহার-ই-দানিশ এবং শায়খ ইনায়েতুল্লাহ রচিত বাহার-ই-দানিশ গ্রন্থগুলো পাঠ করবে। এসব গ্রন্থের মূল পাঠ মনোরম এবং কাহিনীগুলো চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক।

এরপর ইতিহাসের স্থান। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেন ঃ

وبرائے دریافت حقیقت سلاطین بیشین واحوال ممالك وقواعد وضوابط سلطنت سیرو تاریخ بر خواند -

–অতীত রাজা-বাদশাহদের সম্পর্কে অবগতি অবহিতি, বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, রাজ্য শাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনার রীতিনীতি জানার জন্য জীবন চরিত এবং ইতিহাস পাঠ করবে। এ প্রসঙ্গে লেখক নিম্নোক্ত কিতাবগুলোর নামোল্লেখ করেন ঃ

شاهنامه فردوسی ، ظفر نامه از شرف الدین علی ترمذی متضمن فتوحات تیموری، اکبرنامه مشتمل بر احوال اکبر باد شاه . اقبال نامه جها نگیری ، تاریخ فیروز شاهی، مروزم نامه ترجمه مها بهارت -

–ফিরদৌসীর শাহ্‌নামা, শরফুদ্দীন 'আলী তিরমিযী রচিত যাফরনামা, তৎসঙ্গে ফতুহাতে তাইমুরী, আকবরনামা, ইকবালনামা-ই জাহাঙ্গীরী, তারীখ-ই-ফিরূয শাহী এবং মহাভারতের অনুবাদ রযমনামা।

সবশেষে তাযকিয়া-ই-নফস তথা চিত্তের পরিশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের স্থান। এ প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

وبرائے تزکیه نفس و تفقیه اخلاق اخلاق ناصری، اخلاق جلالی، مکاتبات سید شاه شرف الدین احمد یحی منیری، نزهة الارواح ، مثنوی مولوی معنوی، حدیقه حکم ستائی مطالعه در آورد -

চরিত্র গঠন এবং চিত্তের পরিশুদ্ধির জন্য আখলাকে নাসিরী, আখলাকে জালালী, সাইয়েদ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানেরীর পত্রাবলী, নুযহাতুল আরওয়াহ্‌, মাওলানা রূমীর মসনভী এবং হাকীম সুনাইর 'হাদীকা' পাঠ করবে।

শেষ কথা

মুসলিম শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে এটা একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র। আমি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করছি। বিস্তারিত আলোচনার জন্য অনেক ভল্যুম দরকার। এখানে সেই অবকাশ নেই। তবে সন্দেহ নেই যে, একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এ বিন্দু সিন্ধু হতে পারে।

گر چه سلسله نطق من گسست اما –

چه گویم اینکه هنوزم چه آرزو باقیست

بجرعه همه اهل بزم بد مستند –

لبالب ازمئے دو شنیه مند سبو باقی ست

ورق تمام شد و قصه ناتمام بماند –

شب آخر آمد و مد گونه گفتگو باقیست

–আমার বলার সিলাসিলা শেষ হলেও এখানো বলার অনেক বাকী। এক চুমুকেই আসরের সকলে মতোয়ারা, অথচ এখনো অনেক সূরা বাকী! কাগজ তো হয়েছে শেষ কাহিনী এখনো অশেষ; রাত তো হয়েছে শেষ, শতগুণ কথা এখনো রয়েছে বাকী।

গ্রন্থপঞ্জী

১. محمد قاسم فرشته ، تاریخ فرشته ج احالات محمود غزنوی

২. محمد قاسم فرشته، ایضا

৩. محمد قاسم فرشته، ایضا

৪. محمد قاسم فرشته، ایضا

৫. حسن نظامی نیشاپوری، تاج الماثر
ফার্সী ভাষায় রচিত হিন্দুস্তানের প্রাচীনতম ইতিহাস গ্রন্থ, হায়দরাবাদের আসেকিয়া কুতুবখানায় এর এক কপি পাণ্ডুলিপি বর্তমান রয়েছে।

৬. عفیف – سراج الدین، طبقات ناصری

৭. فتوحات فیروز شاهی

৮. برنی، ضیاء الدین

৯. ضیاء الدین برنی

১০. تاریخ فرشته و آثار الصنادید سرسید احمد خان

১১. اسئیفین، آثار دهلی

১২. یاد ایام بحواله چشتی

১৩. نسخه قلمی کتبخانه الاصلاح دسنه، بهار

১৪. غربت نگار بحواله اثریات هند

১৫. اثریات هند

১৬. لاله سیل چند، تفریح العمارات

১৭. منتخب التواریخ

১৮. خوافی خان – منتخب اللباب

১৯. بدایونی، ملا عبد القادر، تاریخ بدایونی

২০. آثریات هند

২১. لاله سیل چند، تفریح العمارات

২২. اثریات هند

২৩. মরহুম আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী-মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রন্থে হিন্দুদের ফার্সী ভাষা চর্চা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২৪. تاریخ فرشته، ذکر سکندر لودی

২৫. تاریخ شاه عالم صفحه ۵۷

২৬. مرساله قطبيه
২৭. রোহিলা খণ্ডের প্রাচীন নাম।
২৮. محمد سعادت يار، گل رحمة
২৯. كنون لال اشكى و نزهة الناظر
৩০. مولوى غلام على آزاد، مآثر الكرام
৩১. ইউ পি হিস্টোরিক্যাল সোসাইটিতে পঠিত হাকীম মোহদীর নিবন্ধ।
৩২. فرنندراناته لا - هندوستان كى علمى ترقى شاهن اسلام كے عهدميں
৩৩. লরেম্প্র নাম লা' মুসলিম শাসনামলে ভারতে শিক্ষার উন্নতি।
৩৪. جونپور نامه
৩৫. প্রাগুপ্ত।
৩৬. নরেন্দ্র নাথ লা' মুসলিম শাসনামলে ভারতে শিক্ষার উন্নতি।
৩৭. تاريخ فرشته جلد دوم
৩৮. ملا عبد الحميد لاهورى، باد شاهنامه جلد دوم صفحه ٧٥٥
৩৯. تذكره روز روشن
৪০. شوق نيموى، ياد گار وطن
৪১. تاريخ فرشته جلد دوم
৪২. বাবু নরেন্দ্র নাথ লা প্রাগুক্ত।
৪৩. প্রাগুক্ত।
৪৪. প্রাগুক্ত।
৪৫. خور سد جهان نامه
৪৬. مأثر الامراء جلد دوم صفحه ٧.٥
৪৭. বাবু নরেন্দ্র নাথ লাম প্রগুক্ত
৪৮. اغصان اربعه
৪৯. تذكرة صبح گلشن
৫০. آثار خير
৫১. مأثر رحيمى جلد اول صفحه ١٢٥ - ذكر محمود خلجى
৫২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২
৫৩. تاريخ فرشته ، بهاء الدين زكر يا ملتانى
৫৪. تاريخ فرشته جلد دوم، ذكر سلطان حسين لنكا

৫৫. تاريخ فرشته جلد دوم، صفحه ٣٢٧١، ذكر سكندر

৫৬. آئين اكبرى، جلد دوم، صفحه ١٨٥

৫৭. تاريخ فرشته جلد دوم، ذكر حسين شاه كشميرى

৫৮. مرآة محمدى

৫৯. ياد ايام

৬০. ياد ايام

৬১. ياد ايام

৬২. ياد ايام

৬৩. ياد ايام

৬৪. حقيقة السورة

৬৫. حقيقة السورة

৬৬. ماثر عالمگيرى صفحه ٥٢٩

৬৭. تاريخ بدايونى

৬৮. تاريخ فرشته، جلد دوم، صفحه ٣٣١

৬৯. تاريخ فرشته، جلد دوم، صفحه ٣٩١

৭০. সামান্য পরিবর্তনসহ ঐতিহাসিক ফিরিস্তাও এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

৭১. آئين اكبرى، جلد اول، دفتر دوم آئين اموزش

৭২. آئين اكبرى، ايضا

৭৩. آئين اكبرى، ايضا

ইফাবা(উ) ২০০৩-২০০৪/অঃসঃ/৪৪১৪—৩২৫০

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র



আবুল হাসানাত নদভী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ